মা[illegible] প্রণেতা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি. এ.

সঙ্কলিত।

"জগাচ্যা কল্যাণা সন্তাচ্যা বিভুতি,
দেহ কষ্টবীতি নানা পরি।"

"জগতের হিত তরে সাধুগণ যত।
দেহক্ষয়, কষ্টভোগ করেন সতত।"

তুকারাম।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা।

মূল্য [illegible] আনা মাত্র

উৎসর্গ-পত্র।

প্রাণাধিকে ভগ্নি, বিনোদিনি,

যে দিন, শৈশবে, দুইজনে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছিলাম, সেই দিন আমাদিগের পরস্পরের স্নেহ আমাদিগের অবলম্বন ও শান্তিস্থল হইয়াছিল। তাহার পর তুমিও চলিয়া গিয়াছ। শূন্য-হৃদয়ে, অশ্রুপাত করিবার জন্য, আমি একা পড়িয়া আছি। কিন্তু তোমার কথা, পিতামাতার কথা, স্মরণ করিয়া অশ্রুপাতেও যে সুখ, পৃথিবীর অপর কিছু তাহা দিতে পারে না। পিতা, মাতা দেবতা; তাঁহাদিগের পূজার যোগ্য উপকরণ আমার কিছুই নাই। তোমার ন্যায় পবিত্র-হৃদয়া, স্নেহময়ী ভগ্নী লাভও অনেক সৌভাগ্যের কথা। তুমি যতদিন জীবিত ছিলে, তোমাকে তোমার উপযুক্ত কোন স্নেহোপহার দিতে আমার যোগ্যতা হয় নাই। এক্ষণে আমি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক মহিলাগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছি। তুমি পরলোকগতা হইলেও আজ তাহা তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে। স্নুষা, সহধর্ম্মিণী এবং মাতারূপে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক, পতিব্রতাগণ যে আনন্দময় লোকে বাস করেন, তুমি এক্ষণে তথায় অবস্থান করিতেছ। একবার সেই লোক হইতে তুমি, "জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে" আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া, এই উপহার গ্রহণ কর; আমি কৃতার্থ হইব।

গ্রন্থ-সূচনা,—মহারাষ্ট্র-দেশ ও মহারাষ্ট্রীয়জাতি—হোলকরবংশ—মহ্লাররাও হোলকর,—তাঁহার বাল্যকাল ও ভাবী সৌভাগ্যের নিদর্শন—ভাগ্যোদয়—দিগ্বিজয়—পাণিপথের যুদ্ধ—মৃত্যু ও চরিত্র-সমালোচনা।

প্রথম অধ্যায়।

অহল্যাবাই—জন্মভূমি ও পিতৃবংশ—পিতামাতার প্রকৃতি—জন্ম সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—বাল্যকাল—বিবাহ—শ্বশুরগৃহে আগমন—সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন—বৈধব্য ও সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প—রাজকার্য্যে শ্বশুরের সহায়তা—পুত্র মালেরাওয়ের সিংহাসনারোহণ—মালেরাওয়ের দুর্ব্যবহারে মনস্তাপ—মালেরাওয়ের শোচনীয় মৃত্যু—রাজ্যভার গ্রহণ—গঙ্গাধর যশোবন্তের ও রাঘোবার ষড়যন্ত্র—অহল্যার নির্ভীকতা—যুদ্ধার্থ উদ্যোগ—শত্রু-দমন—তুকোজীর প্রতি রাজ্যশাসনের ভার প্রদান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অহল্যাবাই ও তুকোজী—অহল্যার রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ—কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা—অহল্যার সম্বন্ধে সারজন ম্যালকমের মত—দৈনন্দিন কার্য্য—অহল্যার সমকালে ভারতসমাজের অবস্থা—নিস্বার্থতা ও উদারতা—প্রজাগণের কল্যাণের জন্য চেষ্টা—কঠোরতা—ভীল-দস্যু-দমন—দান, ধর্ম্মে অর্থব্যয়—ভারতীয় তীর্থসমূহে অহল্যার কীর্ত্তি—সর্ব্বজীবে অনুকম্পা—সমসাময়িক নৃপতিগণের সহিত অহল্যার তুলনা—অহল্যার প্রতি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা।

তৃতীয় অধ্যায়।

অহল্যার সাংসারিক বিপদ—দৌহিত্রের ও জামাতার মৃত্যু—কন্যা মুক্তাবাইএর সহমরণ—অহল্যার শোক—তজ্জনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ—মৃত্যুর পূর্ব্বে ধর্ম্মানুষ্ঠান—মৃত্যু—অহল্যার আকৃতি ও প্রকৃতি—দৃঢ়চিত্ততা ও কোমলতা—বৈরাগ্যের সঙ্গে বিষয়কার্য্যে দৃষ্টি—ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদারতা—তোষামোদকারীর প্রতি উপেক্ষা—অহল্যার জীবনের স্থূল নিষ্কর্ষ ও উপদেশ—অহল্যার সম্বন্ধে কবি ময়ূরপন্থের উক্তি—উপসংহার—অহল্যার সম্বন্ধে একটী মহারাষ্ট্রীয় গাথা।

নূতন সংস্করণের সংশোধিত বিজ্ঞাপ

রাজ্ঞী অহল্যাবাইয়ের চরিত স্বর্গীয় নীলমণি
মহাশয়, সর্ব্বপ্রথমে, তাঁহার "নবনারী" নাম
বিবৃত করেন। তাহার পর আরও দুই একজ
লেখক ইহা প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ
চরিতা মহিলার জীবনবৃত্তান্ত যতই আলোচিত ও স
পরিচিত হয়, ততই মঙ্গল ভাবিয়া আমি ইহা পুস্ত
প্রকাশ করিলাম। সারজন ম্যাল্‌কম কৃত "মধ
ও মালবদেশের ইতিহাস" এবং "হোলকরাঁচী কৈ
নামক মহারাষ্ট্রীয় বখর (ইতিহাস) অবলম্বনে
প্রধানতঃ, সঙ্কলিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্র
অনুবাদের জন্য আমি আমার পরম স্নেহাস্পদ
বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত, শ্রীমান্ সখারাম গণেশ দে
নিকট কৃতজ্ঞ আছি। মহারাষ্ট্রদেশে পবিভ্রম
তিনি এই গ্রন্থ আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনে
তাহার প্রয়োজনীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দেন।
হাসিক গোষ্ঠী" নামক একখানি গ্রন্থ হইতেও তিনি অ
সম্বন্ধে দুইটী আখ্যায়িকা এবং আকওয়ার্থ সাহেবের স
গাথাবলী হইতে একটী গাথা আমাকে সংগ্রহ
দিয়াছেন। এই সকলের জন্য আমি তাঁহার নিকট
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অল্প দিন পরে মহা
ভাষায় লিখিত একখানি অহল্যাবাইএর জীবন-

পুনা হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তাহাতে অহল্যার বাল্যকালেব কতকগুলি বৃত্তান্ত, মহেশ্বরের কোন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট অবগত হইয়া, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশিত অহল্যার বাল্যবৃত্তান্ত, প্রধানতঃ, তাহা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি বিবিধ-জ্ঞান-বিস্তার নামক কোন মহারাষ্ট্রীয় মাসিক পত্রিকায় অহল্যার সম্বন্ধে কতকগুলি কথা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সহিত সার জন ম্যাল্‌কমের এবং পূর্ব্বোক্ত মহারাষ্ট্রীয় লেখকের কোন, কোন কথার সামঞ্জস্য নাই। উপযুক্ত প্রমাণের অপেক্ষায় আমি, আপাততঃ, পূর্ব্বলেখকদিগের কথাই বর্ত্তমান রাখিলাম; প্রয়োজন বুঝিলে পরে তাহা পরিবর্ত্তন করিব।

অহল্যাবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়ায় বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কিন্তু এবার তৃতীয় সংস্করণ হইতে কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হইল না। অহল্যার যে সকল কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার মধ্যে গয়ার বিষ্ণুপদমন্দির, এবং কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও অহল্যাবাইএব ঘাট সমধিক প্রসিদ্ধ। এবার ইহাতে তাহাদিগের এবং সেই সঙ্গে অহল্যার ও তাঁহার পুত্র মালেরাওএর সমাধি-মন্দিবের এবং মহেশ্বর-স্থিত তাঁহার প্রাসাদের হাফটোন চিত্র প্রদত্ত হইল। আশা করি, তদ্দ্বারা ইহার চিত্তাকর্ষকত্ব বর্দ্ধিত হইবে। শিবপূজানিরতা অহল্যাবাই-এর চিত্র আমার চিরানুরক্ত সুহৃদ্, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার সম্পাদিত প্রবাসী পত্রিকার জন্য, সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাকে তাহা ব্যবহারের অনুমতি দানের জন্য, আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করি। অহল্যার সমাধি-মন্দিরের ও তাঁহার প্রাসাদের চিত্র ইন্দোরের চিত্রশিল্পী রামচন্দ্র রাওয়ের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধনের জন্য তাঁহাদিগের পরস্পরের সম্মিলন যেরূপ আবশ্যক, তত্তজ্জাতীয় মহাপুরুষদিগের চরিত-আলোচনাও সেরূপ প্রয়োজনীয়। প্রকৃত মহাপুরুষগণ কোনও একটী জাতির বা দেশের একাধিকৃত নহেন। তাঁহারা সকল দেশের ও সকল জাতিরই জন্য। সংযোগসূত্ররূপে তাঁহারা বিভিন্ন মানবসমাজকে সম্বদ্ধ করেন। অহল্যার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া, যদি একটীও বঙ্গ-সন্তান মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান হন এবং একটীও বঙ্গমহিলা, তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি পূর্ব্বক, আত্মোন্নতির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

অহল্যাবাই প্রথমে লুপ্তস্মৃতি "দাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাই ক্রমে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান সংস্করণে পরিণত হইয়াছে। ইতি—

কলিকাতা,
বঙ্গাব্দ, ১৩১৬ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।
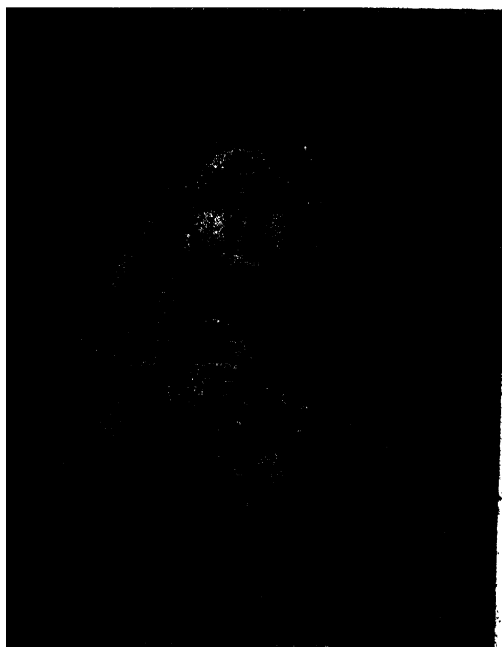
শিবপূজানিরতা অহল্যাবাই।

একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত।

বর্ত্তমান নাই। কোথাও রাজপথ, কোথাও দেবমন্দির কোথাও অতিথিশালা, কোথাও বা স্নানার্থ অবতরণিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি ভারতবাসী হিন্দুস্থান-মাত্রকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পার্থিব কীর্ত্তিসমূহ, কালধর্ম্মে, ক্রমশঃ, জীর্ণ ও বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার অপার্থিব গৌরব কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি কাহারও প্রশংসা-প্রার্থিনী ছিলেন না; তথাপি তাঁহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ এখনও তাঁহাকে দেবীর ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র শ্রোতার হৃদয় অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তিক্ষেত্র গয়াধামের বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি এখনও দেবোচিত সম্মানে অর্চ্চিত হইয়া থাকে। তাঁহার পবিত্র জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে পুণ্যলাভ হয়; সেই জন্য আমরা তাহা বঙ্গীয় পাঠক, পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার বাসনা করিয়াছি।

রাজ্ঞী অহল্যার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, তিনি যে দেশে, যে জাতিতে এবং যে বংশে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। মহারাষ্ট্রীয় জাতির নাম বঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত। এই মহারাষ্ট্রীয় জাতির শাখা বিশেষ

উপক্রমণিকা।

এক সময়ে, "বর্গী" * নামে বঙ্গের নরনারীগণের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। রাজ্ঞী অহল্যাবাই এই মহারাষ্ট্রীয় জাতিতে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। উত্তর দিকে নর্ম্মদানদী ও সাতপুরা পর্ব্বত-শ্রেণী, পশ্চিমে আরবসমুদ্র, দক্ষিণে কৃষ্ণা ও মলপ্রভা নদী, এবং পূর্ব্বে গোণ্ডবন ও তেলঙ্গন প্রদেশ, এই সীমান্তবর্ত্তী ভূভাগ মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। দেশের নামানুসারে এখানকার অধিবাসিগণ মহারাষ্ট্রীয়, চলিত ভাষায় মারাঠা, বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মহারাষ্ট্রীয়গণ সহিষ্ণুতা, দৃঢ়-চিত্ততা, এবং শৌর্য্য প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক মনস্বী পুরুষ ও মনস্বিনী মহিলা মহারাষ্ট্রদেশে জন্মগ্রহণ করাতে ইহার নাম দাক্ষিণাত্যবাসী আর্য্যসমাজের গৌরবস্থল হইয়াছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধনামা ছত্রপতি শিবাজীর সময়েই মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রকৃত জাতীয় অভ্যুত্থান হয়। শিবাজীর ন্যায় মনস্বী ও অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দুই শত বৎসরেরও অধিক হইল, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া

---

* মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "বার্‌গীর" শব্দের অর্থ অশ্বারোহী।—মহারাষ্ট্রদেশীয় ভোঁসলা রাজগণের অশ্বারোহী সৈনিকগণ বঙ্গদেশের অনেকস্থল লুণ্ঠন করিয়াছিল বলিয়া, বর্গী নাম এদেশে সকলেরই পরিচিত, এবং মহারাষ্ট্রীয় শব্দের সহিত সমার্থবোধক হইয়াছে।

গিয়াছেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় চক্রে তিনি যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাহা এখনও ঘূর্ণিত হইতেছে। যে সময়ে দিল্লীর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুরাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে সময়ে কেবল তিনিই মাত্র ভারতভূমিতে এক অভিনব হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক দিন তাঁহার নামে, কেবল মহারাষ্ট্রীয় জাতি নহে, সমগ্র হিন্দুজাতিই সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছিল এবং এখনও তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব ইতিহাস লক্ষ, লক্ষ-হিন্দু-সন্তানকে স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতি-প্রেম সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেছে। পুরুষকার বলে মনুষ্য কিরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে, শিবাজীর জীবন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল।

শিবাজীর আবির্ভাবের সঙ্গে ও অব্যবহিত পরে মহারাষ্ট্রদেশে আরও অনেক খ্যাতনামা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শিবাজীর ন্যায় তাঁহারাও, অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থা হইতে, আপন, আপন উদ্যমবলে, এক একটী নূতন রাজ্য ও নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনেকের বংশধরেরা মহারাষ্ট্রদেশে এখনও রাজত্ব করিতেছেন। এই সকল স্বনামখ্যাত বীরপুরুষগণের মধ্যে মহলাররাও হোল্‌করের নাম অতি প্রসিদ্ধ। আমরা যাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই দেবী-

রূপিণী অহল্যাবাই ইঁহারই পুত্রবধূ। সেই জন্য আমরা, প্রথমে, মহ্লাররাওয়ের পরিচয়দান করিব।

মহ্লাররাও হোল্‌কর অতি সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের বংশের নাম কাহারও পরিচিত ছিল না। অবলম্বিত ব্যবসায় অনুসারে তাঁহাদিগের বংশ "ধনগর" অথবা পশুপাল নামে পরিচিত ছিল।* মহ্লাররাওয়ের পিতা খণ্ডুজী পুনা হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে হোল্ নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেন। পশুপালন ও কৃষিকার্য্য দ্বারা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "কর্" প্রত্যয় অধিবাসী অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ডুজীর বংশধরগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের আদি বাসস্থান হোল্ গ্রামের নামানুসারে "হোল্‌কর" খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। †

মহ্লাররাও হোল্‌কর ষোলশত তিরনব্বই খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চারি পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে

---

* মূলতঃ ক্ষত্রিয়-সম্ভব হইলেও হোল্‌কর বংশ, দরিদ্রতা বশতঃ, ক্রমে, বৈশ্য, শূদ্রাদির ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জাতিগত মর্য্যাদা হইতে স্খলিত হইতে হইয়াছিল। এখনও এই বংশের অনেকে অত্যন্ত হীনাবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। মহ্লাররাওয়ের চেষ্টায় কতিপয় পরিবারের উন্নতি ঘটিয়াছিল।

† অনেক মহারাষ্ট্রীয় পরিবারই বাসস্থানের নামানুসারে এইরূপ

তাঁহার পিতা খণ্ডুজীর মৃত্যু হয়। স্বামীব মৃত্যুর পর মহ্লাররাওয়ের মাতা, জ্ঞাতিগণের সহিত বিবাদবশতঃ, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, শ্বশুরভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপনার ভ্রাতা নারায়ণজীর * আশ্রয়ে আসিয়া বাস কবেন। নারায়ণজী খান্দেশের অন্তর্গত তলোদেঁ নামক একটী পল্লীতে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, এবং তিনি কোন মহারাষ্ট্রীয় সামন্তের অধীনে কতকগুলি অশ্বসৈনিকের নায়কত্ব করিতেন। স্বজাতির রীতি অনুসারে তিনি বালক ভাগিনেয়কে আপনার পশুপালরক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় মহ্লাররাওয়ের সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া গিয়া থাকে। † যখন তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র, তখন, পশুচারণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, একদিন, তিনি একটী বৃক্ষমূলে নিদ্রা যাইতেছিলেন। পত্রের অন্তরাল দিয়া সূর্য্যালোক তাঁহার মুখের উপর পতিত হইতেছিল। একটী বিষধর সর্প, দেখিতে পাইয়া, ফণা বিস্তার পূর্ব্বক, তাঁহাকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল, এবং মহ্লাররাও

---

* সার জন ম্যাল্‌কম্ লিখিয়াছেন নারায়ণজী; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় বখরে আছে ভোজরাজজী।

† এরূপ ঘটনা ভারতবর্ষের আরও অনেক রাজবংশের আদিপুরুষদিগের সম্বন্ধে শ্রুত হওয়া যায়।

জাগ্রত হইলে, তাঁহার কোন অনিষ্ট না করিয়া, ধীরে ধীরে, সেখান হইতে প্রস্থান করিল। অন্যান্য রাখাল-বালক ও নারায়ণজীর প্রতিবাসিগণ এই দৃশ্যে বিস্মিত হইলেন এবং বালক মহ্লাররাওয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা ক্রমশঃ নারায়ণজীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি একজন দৈবজ্ঞকে আহ্বান পূর্ব্বক ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন যে, এই বালক, উত্তর কালে, একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন। নারায়ণজী শুনিয়া ভাগিনেয়কে মেষচারণ কার্য্য হইতে বিরত করিলেন, এবং তিনি উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে আপনার অধীন অশ্বসৈনিক-দলে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এক একটী সামান্য ঘটনা হইতে, অনেক সময়ে, মনুষ্যের জীবনের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হয়; বালক মহ্লাররাওয়েরও সম্বন্ধে-সেইরূপ ঘটিয়াছিল। যে দিন তিনি দৈবজ্ঞের মুখে অবগত হইলেন যে, বিধাতা তাঁহাকে কোন মহৎ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে নূতন আশার ও নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল। মাতুলের অশ্বসৈনিক-দলে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি প্রগাঢ় উৎসাহের ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভারতসন্তানগণ, এখনকার ন্যায়, নিরস্ত্র হীনবীর্য্য হন নাই। শারীরিক বল, সাহস, শৌর্য্য

এবং সহিষ্ণুতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ যাঁহার যে পরিমাণে থাকিত, তিনি, তখন, সেই পরিমাণে, উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন। মহ্লাররাও যে সমাজে ও যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তখন যুদ্ধ ও রক্তপাতই নিত্য কর্ম্মের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল; সুতরাং বীরপুরুষের পক্ষে কার্য্যক্ষেত্রের অভাব ছিল না। একটী যুদ্ধে যুবক মহ্লার-রাও সুপ্রসিদ্ধ নিজাম-উল্-মুল্কের একজন খ্যাতনামা সেনাপতিকে নিহত করাতে তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল, এবং তাঁহার মাতুল নারায়ণজী তাঁহাকে সমাদরে আপন কন্যাদান করিলেন। *

মহ্লাররাওয়ের সৌভাগ্যমন্দিরের ভিত্তি এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিরূপে বালক মহ্লাররাও মেষরক্ষকের কার্য্য হইতে একটী বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এবং কিরূপে তিনি, শত যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া, স্বজাতির অন্যতম নেতা হইয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত বিবৃত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও, তাহা আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের

* দাক্ষিণাত্যের অনেক জাতির মধ্যে, এমন কি, [illegible] ব্রাহ্মণসমাজেও, এরূপ সম্বন্ধীয় বিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক স্থলে এরূপ বিবাহ শ্রেষ্ঠ, এবং [illegible] আচার
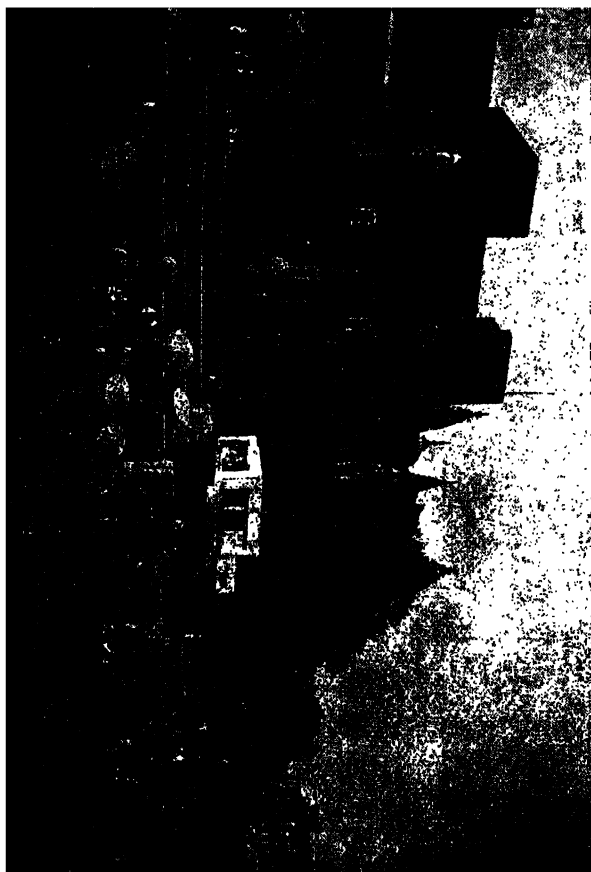
পক্ষে অতি-দীর্ঘ হইবে। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কখনও বীর্য্য, কখনও বুদ্ধিমত্তা, কখনও সাহস, কখনও বা রাজনীতিচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া তিনি আপনার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহসের ও বীরত্বের কথা শুনিয়া মহারাষ্ট্রীয় সমাজের তদানীন্তন নেতা, পেশোয়া বাজীরাও, তাঁহাকে আপনার অধীন পাঁচশত অশ্বসৈনিকের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহ্লাররাও নূতন প্রভুর নিকটে দ্বিগুণ উৎসাহের ও বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করাতে ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁহার প্রতি উত্তরোত্তর প্রসন্না হইয়াছিলেন। তাঁহার বিক্রম-বলে নিজাম-আলি নামে পেশোয়ার একজন মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হইয়াছিল, এবং পর্তুগীজদস্যু কর্তৃক উৎপীড়িত কঙ্কনদেশ শান্তিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া বাজীরাও, ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে, নর্ম্মদার উত্তর কূলস্থ দ্বাদশটী জিলা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ দান করিয়াছিলেন; এবং ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরও সোত্তরটী জিলা সেই সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে মালবদেশ লইয়া মুসলমানদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মহলাররাও সেই যুদ্ধে এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, পেশোয়া বাজীরাও তাঁহার গুণে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে [illegible]

সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং, অবশেষে, মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, মহ্লাররাওয়ের সৈন্যগণের ভরণপোষণার্থ তিনি তাঁহাকে ইন্দোর প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। ইন্দোর সেই সময় অবধি হোল্‌কর-বংশীয়গণের রাজধানী হইয়াছে।

যে বালক, এক সময়ে, গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে তপ্ত এবং বর্ষার অবিরল ধারায় সিক্ত হইয়া, পশুচারণ করিতেন, এইরূপে তিনি একটী বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইলেন। মালববিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মহ্লাররাও মহারাষ্ট্রচক্রের পরিচালনায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন মোগল-সাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থা। দিল্লীশ্বরদিগের সেই পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব প্রতাপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। নববল-দৃপ্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্ত হইতে স্বরাজ্য-রক্ষা করিবার সামর্থ্য তখন তাঁহাদিগের ছিল না। সৌভাগ্যের দিনে, কোন কোন মুসলমান সম্রাট্ তাঁহাদিগের হিন্দু প্রজাগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়গণ তখন পূর্ণমাত্রায় তাহার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কখনও মুসলমানদিগের মসজিদ চূর্ণ করিয়া, কখনও বা তাঁহাদিগের পীর বা সাধুগণের

তাঁহারা মামুদ, আলাউদ্দীন ও আওরঙ্গজেবের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতেছিলেন। মহ্লারবাও হোল্‌কর এই সকল অভিযানের নেতা ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভারতভূমির তখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে হিন্দুজাতির মধ্যে কেহ উদ্‌যোগী পুরুষ থাকিলে ভারত-লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্ক-শায়িনী হইবেন। সেই জন্য দক্ষিণা-পথের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তেও হিন্দুজাতির, বিশেষতঃ, মহারাষ্ট্রীয়-দিগের, প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছিল। অযোধ্যা হইতে সিন্ধুনদের উপকূল, এবং রাজপুতনার শৈলমালা হইতে কুমায়ুনের পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ, মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণে উপক্রুত হইয়াছিল। মোগল সম্রাটগণ, যতদিন সম্ভব, মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগকে দমন করা সম্ভবপর নহে, তখন তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। নিষ্ক্রয় ও রাজ্যাংশ প্রদানে বশীভূত করিয়া তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগকেই তাঁহাদিগের শত্রুগণের দমনে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দিল্লীশ্বরের এইরূপ [illegible] একবার মহ্লাররাও রোহিলাগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। বীরত্বের ন্যায় [illegible]-কৌশলের [illegible]

হারাষ্ট্রীয়-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইত। মহলাররাও রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধে এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। আপনার সৈনিকদিগকে রোহিলাগণের অপেক্ষা সংখ্যায় ন্যূন দেখিয়া তিনি শত্রুপক্ষকে রাত্রিযোগে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি সসৈন্যে শত্রুশিবিরের একাংশ আক্রমণ করিলেন এবং বহুসংখ্যক বৃষ ও মহিষের শৃঙ্গে আলোকবর্ত্তি বন্ধন করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে শিবিরের অপরাংশে প্রেরণ করিলেন। শত্রুগণ, অন্ধকারে আক্রান্ত হইয়া, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। ইতস্ততঃ সঞ্চরণ-শীল আলোক-মালায় এবং পশুপালদিগের চীৎকারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, দুইদিক হইতে, দুইটী স্বতন্ত্র সৈন্যদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তখন তাহারা শ্রেণীভঙ্গ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।* মহলাররাও এইরূপে বিজয়লাভ করিলেন এবং শত্রু-শিবির তাঁহার অধিকৃত হইল। দিল্লীশ্বর, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে চান্দোর প্রদেশের রাজস্বের অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু মহলাররাও. কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেও,

---

* মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, বীরবর শিবাজী একবার এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁকে পরাভূত করিবার জন্য শিবাজীও একবার এইরূপ কৌশলের

তখনও আপনাকে পেশোয়ার সেনাপতি মাত্র বিবেচনা করিতেন ; সুতরাং প্রভুর অজ্ঞাতসারে ও অনভিমতে তিনি এইরূপ পুরস্কার গ্রহণে সম্মত হন নাই। চান্দোর প্রদেশের “দেশমুখ” এই উপাধি মাত্র গ্রহণ করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। হোল্‌কর বংশে এই “দেশমুখ” পদবী অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

মোগল-সাম্রাজ্য, এই সময়ে, একদিকে, যেমন অন্তর্বিদ্রোহে হীনবল হইয়াছিল, অপরদিকে, বহিঃশত্রুগণের আক্রমণেও, তেমনই উৎপীড়িত হইতেছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আহম্মদ-সা-আব্‌দালী, এই সময়ে, আপনার দুর্দান্ত আফগান-সৈনিকগণের সহিত পঞ্জাব লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব বিধ্বস্ত করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণই, তখন, প্রকৃত প্রস্তাবে, ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং এই অভিনব শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য তাঁহাদিগকেই প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। থানেশ্বর ক্ষেত্রের ন্যায় পাণিপথ ক্ষেত্রেও আর একবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষিত হইল ; এবং বিজয়লক্ষ্মী পূর্ব্বের ন্যায় এবারও মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। পাণিপথ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাজিত না হইলে হিন্দুস্থান হয়ত আবার হিন্দুরই হইত। কিন্তু বিধাতার তাহা ইচ্ছা ছিল না। বিপুল পরাক্রম ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়গণ

বিজয় লাভ করিতে পারিলেন না। হিন্দুর যে গৃহ-বিবাদ, ভারতে প্রথম মুসলমান-রাজ্য সংস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল, এখানেও তাহা হিন্দুর সর্ব্বনাশের কারণ হইল। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি সদাশিব-রাও ভাউএর আত্মাভিমান ও অসহিষ্ণুতা বশতঃ মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল। মহ্লাররাও, অন্যান্য মহাবাষ্ট্রীয় বীরগণের ন্যায় স্বদেশের ও স্বজাতিব গৌরব বক্ষাব জন্য পাণিপথ-ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। গর্ব্বিত সদাশিবরাও তাঁহার সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার কবিতেন না; * বরং মহ্লাররাও তাঁহাদিগের বংশের ভৃত্য বলিয়া, অনেক সময়ে, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। একবার মহ্লাররাও তাঁহাকে কোন পরামর্শ দান করিলে, তিনি সভাস্থলেই সকলের সমক্ষে বলিলেন, "আমি মেষ-পালকের পরামর্শ শুনিতে চাই না।" বলা নিষ্প্র-য়োজন যে, তেজস্বী মহ্লাররাও, সর্ব্বজন সমক্ষে

---

* কিছুদিন হইল, সদাশিব রাওয়ের স্বহস্ত লিখিত যে সকল পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মহ্লাররাওকে নিতান্ত নির্দ্দোষ বিবেচনা করা যায় না। মহ্লাররাও স্বীয় প্রভুত্ব বৃদ্ধির জন্য গোপনে পেশোয়াগণের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছেন, সদাশিব রাওয়ের এইরূপ সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। এই কারণে মহ্লাররাওয়ের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়াছিল; তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা গোপন করিতে পারেন নাই।

এইরূপ অবজ্ঞাত হইয়া, দারুণ বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। যে উৎসাহের ও স্ফূর্ত্তির সহিত তিনি রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা অন্তর্হিত হইল। মহারাষ্ট্রীয় জাতির দক্ষিণ বাহু এইরূপে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আঘাতে বলহীন হইয়া পড়িল। মহ্লাররাও নিজ সৈন্য, সামন্ত সহ নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিলেন। পাণিপথের ভয়ঙ্কর পরিণাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এই যুদ্ধে এত অধিক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল যে, মহারাষ্ট্র-দেশে এমন পরিবার অতি অল্পই ছিল, যাঁহাদিগকে এই যুদ্ধে হত বা আহত কাহারও জন্য অশ্রুপাত করিতে হয় নাই। একমাত্র মহ্লাররাওই, কেবল, আপনার সৈন্য, সামন্তগণের সহিত, সাবধানে, আত্মরক্ষা করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। পাণিপথ যুদ্ধের পর, মহারাষ্ট্র-চক্রের অন্যান্য সকলে হীনবল হইয়া পড়াতে, মহ্লাররাও স্বজাতীয়গণের নেতৃস্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের ঘটনাবলী আমাদিগের গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় নহে। সংক্ষেপে এই বলিলেই হইবে যে, বহুদিন রাজত্ব ভোগের পর, পূর্ণ বয়সে এবং পূর্ণ গৌরবে, তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। দোষ, গুণ সমস্ত লইয়া বিবেচনা করিলে মহ্লাররাওয়ের ন্যায় পুরুষ মহারাষ্ট্রীয়জাতির মধ্যে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে। রক্তপাত ও যুদ্ধ-

বিগ্রহের মধ্যে যাঁহাদিগকে নিজের পথ পরিষ্কৃত করিতে হয়, তাঁহাদিগের চরিত্রে গুণের ন্যায় দোষও যথেষ্ট থাকে; মহ্লাররাওয়েরও ছিল। শিবাজী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই তখন মহারাষ্ট্রীয়গণের আদর্শ স্বরূপ ছিল। স্বদেশবাৎসল্য ও স্বধর্ম্মানুরাগ, শৌর্য্য ও সাহস, ভোগসুখবিতৃষ্ণা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের সঙ্গে, কূট নীতিপরায়ণতা, প্রতিহিংসাপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের প্রকৃতিতে তখন যথেষ্ট লক্ষিত হইত। শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিবার জন্য সদসৎ যে কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারা যায়, এইরূপ সংস্কার তাঁহাদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং মহ্লাররাওয়ের সকল কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে তাঁহার এই একটী প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি অকারণ কাহারও উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন না। পরাজিত শত্রুকে, অনেক সময়ে, তিনি সদ্ব্যবহার দ্বারা বশীভূত করিতেন। পশুপালের অবস্থা হইতে তিনি যে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে কথা তিনি কখন বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু দানশীলতাই তাঁহার

* The principal virtue of Mulhar Row was his generosity. * * * To his relations, and indeed to all Mahrattas, he was uncommonly kind."—Malcolm's *Central India and Malwa* Page 128-29.

চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল। আত্মীয়, স্বজনের, এমন কি, সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রতি তাঁহার করুণা-স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইত। মহ্লাররাওয়ের স্ত্রী গৌতমাবাইও, অনেক বিষয়ে, স্বামীর অনুরূপা রমণী ছিলেন। তিনি, একদিকে, যেমন গৃহকর্ম্মে দক্ষা, অপর দিকে, তেমনই অতীব সাহসসম্পন্না ছিলেন। স্বামী কখনও কোন যুদ্ধে পরাভূত হইলে তিনি তাঁহাকে, পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিয়া, যুদ্ধে প্রেরণ করিতেন এবং যতদিন না জয়লাভ ঘটিত, ততদিন তাঁহাকে শত্রুদমনার্থ উত্তেজিত করিতে বিরত থাকিতেন না। রাজ্ঞী অহল্যাবাই শ্বশুর ও শ্বশ্রূর পূর্ব্বোক্ত অনেকগুলি গুণেরই অধিকারিণী হইয়াছিলেন। মহ্লাররাওয়ের দানশীলতা ও আত্মীয়-বাৎসল্য এবং গৌতমাবাইএর দৃঢ় চিত্ততা তাঁহার প্রকৃতিতে শত গুণ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার গুণে তিনি শ্বশুরকুলের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সুপুত্রের ন্যায় সুবধূরও দ্বারা যে বংশ উজ্জ্বল হয়, অহল্যার জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

অহল্যাবাই যে সমাজে, যে দেশে, এবং যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত হইয়াছে; অতঃপর আমরা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

অহল্যাবাই।

প্রথম অধ্যায়।

১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মালবদেশের অন্তর্গত। পাথরডী নামক একটী সামান্য গ্রামে অহল্যাবাইএর জন্ম [illegible] পাথরডী আধুনিক অহম্মদনগর জিলাব অন্তর্গত। পূর্বে তথায় পেশওয়ে নৃপতিগণের সেনানিবাস ছিল ও অনেক সম্ভ্রান্ত মারাঠা-পরিবার তথায় বাস করিতেন। অহল্যা-বাই যে-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শিন্দে নামে পরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ শিন্দে (সিন্ধিয়া) রাজবংশের সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল। অহল্যার পিতার নাম আনন্দরাও

শিন্দে। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, পরোপকারী ও অতিথিপরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কৃষিকার্য্য দ্বারা তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। বহুদিন পর্য্যন্ত অপত্যলাভে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া আনন্দরাও শিন্দে ও তাঁহাব সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন। অপত্যলাভেব আশায় তাঁহারা নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও ব্রতাদিব আচবণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এইরূপে, কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা, মধ্যাহ্ন সময়ে, বিভূতি-ভূষিত দেহ, জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী, তাঁহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া, আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। আনন্দরাও তখন গৃহে ছিলেন না। তাঁহাব, অতিথিপরায়ণা পত্নী, স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া, নিজেব ও স্বামীব জন্য প্রস্তুত অন্ন তাঁহাকে প্রদান কবিলেন। ভোজনান্তে পবিতৃপ্ত সন্ন্যাসী, গৃহ-স্বামিনীর বিষাদেব কারণ অবগত হইয়া, তাঁহাকে কোহ্লাপুরে গমন পূর্ব্বক, তত্রস্থ জগদম্বা দেবীর আরাধনা করিতে উপদেশ দান করিলেন। আনন্দরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর উপদেশ অনুসারে কোহ্লাপুরে গমন করিয়া, শুদ্ধচিত্তে, জগদম্বার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রা[illegible] বৎসর কাল এই ধার্ম্মিক দম্পতি, কোহ্লাপুরে অবস্থান পূর্ব্বক, ভগবতীর আরাধনা করিলে, একদিন দেবী স্বপ্নে আবি

ভূর্তা হইয়া আনন্দরাওকে বলিলেন, "আমি তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। তোমাকে আর কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না, তুমি নিজ গৃহে প্রতিগমন কর।" আনন্দরাওয়ের পত্নীও সেই দিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, কোন সর্ব্বাভরণভূষিতা রমণী, তাঁহার ললাটে সিন্দুরবিন্দু প্রদান করিয়া, একটী সদ্যোজাতা কন্যা তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক, অদৃশ্যা হইলেন। এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া, তাঁহারা উভয়ে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অনন্তর, যথাবিধি, ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইয়া, তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে স্বগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে আনন্দরাও যে কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নাম অহল্যাবাই। গ্রামস্থ কোনও জ্যোতির্ব্বিদ্ তাঁহার কোষ্ঠী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, অহল্যা রাজ্যের অধীশ্বরী ও নিজগুণে সর্ব্বত্র পূজিতা হইবেন।

অহল্যা বাল্যকালে অতি সুশীলা ও স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়া ছিলেন বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। পাতরডী গ্রামে একটী পাঠশালা ছিল। তাহার শিক্ষকের সহিত আনন্দরাওয়ের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এই শিক্ষকের সস্নেহ উপদেশগুণে অহল্যার বাল্যকালে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা হইয়াছিল।

উত্তরকালে অহল্যা যে, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি পাঠ করিয়া, ধর্ম্মালোচনায় ও শাস্ত্রিতে কালাতিপাত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রাম্য-শিক্ষকের সাহায্যে ও অনুগ্রহেই ঘটিয়াছিল।

অহল্যা নবমবর্ষে পদার্পণ করিলে আনন্দরাও কন্যার জন্য পাত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে মহা-রাষ্ট্রীয় সেনানীগণ, গুজরাট ও মালবদেশের বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক, তথা হইতে পুনায় প্রত্যাগমন কালে, পাথরডী গ্রামের সেনানিবাসে বিশ্রামার্থ অবতরণ করিয়াছিলেন। মহলাররাও ও তাঁহার পুত্র ইহাদিগের সঙ্গে ছিলেন। একদা সেনানীগণ আনন্দরাওয়ের গৃহের নিকটবর্ত্তী মারুতির মন্দিরে বসিয়াছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালার গুরু-মহাশয়ও, তাঁহাদিগের নিকটে বসিয়া, কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময়ে গুরুমহাশয়কে তথায় দেখিয়া, তাঁহার প্রিয়শিষ্যা অহল্যা সেখানে আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন। গুরুমহাশয় অহল্যাকে এরূপ স্নেহ করিতেন এবং অহল্যাও তাঁহার প্রতি এরূপ ভক্তিমতী ছিলেন যে, তিনি সর্ব্বদাই পিতৃবন্ধুর নিকটে থাকিতে ভাল-বাসিতেন। মহলাররাও এই সুযোগে আপনার ভাবী পুত্রবধূকে দর্শন করিলেন। অহল্যা দেখিতে রূপবতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে এমনই একটী কম

ভাব ছিল যে, দর্শনমাত্রই তাহা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিত। সমবেত সেনানীগণ অহল্যার সরল, সুন্দর মুখ ও তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মহ্লাররাও, গুরুমহাশয়ের নিকট অহল্যার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে আপনার পুত্রবধূ কবিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আনন্দরাও ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, এরূপ সম্বন্ধ বিধিপ্রেরিত ভাবিয়া, তাঁহাব প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কোথাও বা পিতা, মাতা, প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া, কন্যাব জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন না; আবার কোথাও বা অযাচিত ভাবে সুসম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্যই বিধিলিপিতে বা জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে হিন্দুজাতি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। নতুবা সাধারণ কৃষিজীবীর দুহিতা, এরূপ ভাবে "রাজরাণী" হইয়া, পিতৃকুল ও শ্বশুর-কুল সমুজ্জ্বল করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন কেন?

ইহার কিয়দ্দিবস পরে মহ্লাররাওয়ের একমাত্র পুত্র খণ্ডেরাওয়ের সহিত পুনানগরীতে অহল্যার শুভ বিবাহ, মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই বিবাহ উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা স্থানের রাজন্যবর্গ আহূত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কন্যা রাজবধূ হওয়ায়, আনন্দরাও হর্ষ-নির্ভর চিত্তে, ব্রাহ্মণগণকে আপনার সর্ব্বস্ব দান

করিয়াছিলেন। অহল্যার বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হয়।

যে দেশে পুরুষদিগেরও চরিত বিশদরূপে অবগত হওয়া যায় না এবং ইতিহাস, পুরাণ এবং কিম্বদন্তী যেখানে অবিভাজ্যরূপে পরস্পর জড়িত, সেখানে কোন রমণীর জীবন-বৃত্তান্ত সংকলন করিতে চেষ্টা করিলে, পদে পদে, ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ হিন্দুকুলবধূর জীবন, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, এরূপ ভাবে অতিবাহিত হয় যে, বহির্জ্জগতের লোকের তাহা অবগত হইবার সুযোগ থাকে না। সুতরাং অহল্যার জীবনের গার্হস্থ্য-ঘটনাবলী বিস্তৃতরূপে জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে ইতিহাস লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া, আমরা অহল্যার জীবন-বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে, অবগত হইতে পারি। হোলকরাঁচী কৈফিয়ৎ (হোলকর বংশের বিবরণ) নামক বখর (ইতিহাস) গ্রন্থে অহল্যার জীবনের এই অংশ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা নিম্নে তাহার কতিপয় আবশ্যক স্থলের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি।

"বিবাহের পর, শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া, অহল্যা ভক্তি পূর্ব্বক শ্বশ্রূর ও শ্বশুরের সেবায় নিযুক্তা হইলেন। তাঁহার শ্বশুর, ভক্তোজীর মল্লাররাও, অতিশয় তেজস্বী, উগ্রস্বভাব,

এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি, সময়ে সময়ে, অকার্য্যে বা সামান্ত কার্য্যে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতেন। পিতৃগৃহে পরিমিতাচারে অভ্যস্তা অহল্যা তাঁহার অমিতব্যয়িতার ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্ত মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিতা হইতেন; কিন্তু তজ্জন্ত তিনি কখনও শ্বশুরের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন বা তাঁহার সেবায় ঔদাসীন্ত প্রকাশ করেন নাই। মহলাররাও পুত্রবধূকে তাঁহার বালিকাবস্থা হইতেই অতিশয় স্নেহ করিতেন! নিজের মনের বিরক্ত ও সন্তপ্ত অবস্থাতেও অহল্যা যখন যাহা প্রার্থনা জানাইতেন, তিনি কখনও তাহা অপূর্ণ রাখিতেন না। তিনি সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে "প্রচণ্ড-প্রতাপান্বিত ও কালস্বরূপ" ছিলেন; কিন্তু অহল্যাবাইএর প্রতি তাঁহার প্রীতির ও বিশ্বাসের সীমা ছিল না। এমন কি, রুগ্নাবস্থায়, অহল্যা তাঁহাকে যতটুকু জল পান করিতে বলিতেন, তিনি ততটুকুই পান করিতেন। অহল্যার শ্বশ্রূ গৌতমাবাইও কিঞ্চিৎ উগ্রস্বভাবা ছিলেন। কিন্তু সেবা, সহিষ্ণুতা, এবং কার্য্যদক্ষতাগুণে অহল্যা তাঁহাকেও বশীভূতা করিয়াছিলেন।

অহল্যা তাঁহার শ্বশুরের ও শ্বশ্রূর পরম আদরের বধূ ছিলেন; তাঁহার দাস, দাসীর অভাব ছিল না; তথাপি তিনি কখনও সাংসারিক কার্য্যে ঔদাসীন্ত বা পরিশ্রমে

বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। তিনি, সমস্ত দিন গৃহকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, রাত্রি প্রহরাতীত হইলে, শয়নকক্ষে গমন করিতেন, এবং ছয় ঘটিকা (দণ্ড) রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে, শয্যা ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। যে সকল মহিলা, ধন বা সম্ভ্রমের গর্ব্বে, গৃহিণীযোগ্য পরিশ্রমে বিমুখ হইয়া, আপনাদিগের গৃহস্থালীতে অভাব ও অশান্তি আনয়ন করেন, অহল্যাব আচরণ তাঁহাদিগের সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

বাল্যকাল হইতেই অহল্যা পাপভীরু ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। অম্বাদাস পৌরাণিক নামক জনৈক সদাচারশীল ব্রাহ্মণের নিকট "পরত্রসাধনের ব্যবস্থা" (দীক্ষা) গ্রহণ করিয়া, তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ইষ্টদেবতার "দাস্য" করিতেন। পাছে তাঁহাকে বালিকা ভাবিয়া, তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ তাঁহাকে নিবারণ করেন, সেই ভয়ে তিনি, অনেক সময়ে, গোপনে, পূজা অর্চ্চনাদি করিতেন। যৌবনেও তিনি কখনও বিলাস-সুখে বৃথা সময় নষ্ট করেন নাই। শূদ্রাণী হইয়াও তিনি "শিষ্টসম্প্রদায়" ব্রাহ্মণগণের ন্যায়, নিত্য, যথানিয়মে, স্নান, সন্ধ্যা এবং দেবার্চ্চনা করিতেন। ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার জাতি-সম্বন্ধ ছিল না, এই মাত্র; নতুবা ধর্ম্মাচরণে তিনি সদাচারশীল ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন ছিলেন না।"

অহল্যা কিরূপ দাম্পত্য সুখের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু যিনি নিজগুণে আত্ম, পর সকলকেই সুখী করিয়াছিলেন, এবং স্থাবর, জঙ্গম সকলেরই প্রতি যাঁহার করুণা অজস্র-ধারে প্রবাহিত হইত, তিনি যে পতির চিত্তানুবর্ত্তন এবং সহিষ্ণুতা ও সংযম দ্বারা আপনার গার্হস্থ্য জীবন মধুময় করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধে সুখী হউন, আর দুঃখীই হউন, পতিসেবা অহল্যার জীবনে অধিক দিন ঘটে নাই। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের নিকটবর্ত্তী কুম্ভেরী নামক দুর্গ অবরোধ কালে অহল্যার স্বামী খণ্ডেরাও নিহত হন এবং সেই হইতে অহল্যার সাংসারিক সুখের আশা অন্তর্হিত, হয়। বৃদ্ধ বয়সে সুভেদার মহলাররাও একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুর জন্য নিদারুণ মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অহল্যার বয়স কেবল অষ্টাদশ বর্ষমাত্র হইয়াছিল, এবং তখন তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অহল্যা অতিমাত্র শোকাকুলা হইয়া চিতারোহণের সঙ্কল্প করিলেন। অনেকেই তাঁহাকে নিষেধ করিল, কিন্তু তিনি যখন কাহারও কথায় সঙ্কল্পচ্যুতা হইলেন না, তখন তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর মহলাররাও, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, গদ্‌গদ কণ্ঠে,

তাঁহাকে বলিলেন,—"মা! তুমি কি আমাকে এই নিদাঘ-তপ্ত সংসার-মরুতে নিরাশ্রয় ও ছায়াহীন করিয়া ফেলিয়া যাইতে চাহিতেছ? খণ্ডুজী এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে যে শোকার্ণবে ফেলিয়া গিয়াছে, তোমার মুখ চাহিয়া আমি তাহা বিস্মৃত হইব, মনে করিতেছি। রাজ্যপালনে তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তাহা হইলে, আমি আমার অহল্যা মরিয়াছে, ও খণ্ডু জীবিত আছে, এইরূপ মনে করিব। রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও সম্পত্তি-রক্ষণ বিষয়ে তোমাকে খণ্ডু নাম প্রদান পূর্ব্বক (অর্থাৎ তোমায় "আমার খণ্ডু" জ্ঞানে সমস্ত ভার তোমার উপর অর্পণ পূর্ব্বক) আমি যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য-বিস্তারাদি বাহ্য বিষয়ের চিন্তা লইয়াই থাকিব, মনে করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ করা এক্ষণে তোমার হস্তে। এই ভাবিয়া তোমার যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা কর। মা! আজ হইতে আমাকে তোমার সন্তান বলিয়া মনে করিবে।" এই বলিয়া সুভেদার, পুত্রবধূর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক, শোক-বিহ্বল-চিত্তে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। করুণহৃদয়া অহল্যা, দুঃসহ পতিবিয়োগ-বেদনায় মুহ্যমানা হইয়াও, বৃদ্ধ শ্বশুরকে "ইষ্টদেবতাস্বরূপ আরাধ্য জ্ঞানে" তাঁহার অনুরোধে, চিতারোহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন।

সংসারের ভার স্কন্ধে পতিত হইলে অহল্যা তাঁহার দারুণ শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃতা হইতে পারিবেন ভাবিয়া এবং তাঁহার বুদ্ধির ও ধর্ম্মজ্ঞানের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়া, মহ্লাররাও পুত্রবধূর উপর রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। আয়, ব্যয় ও ক্ষতি-বৃদ্ধি-গণনা, এবং আশ্রিতগণের পালন ও ভৃত্যাদি নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্যের ভার অহল্যার উপর অর্পিত হইল। মহ্লাররাও সন্ধি, বিগ্রহ ও দেশ জয় প্রভৃতি বাহ্য বিষয় লইয়া থাকিতেন; কিন্তু রাজ্যেব আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ভার অহল্যারই উপর থাকিত। অর্থ-সংগ্রহ সুভেদারেরই পরাক্রমের ও ভাগ্যের ফলে ঘটিত; কিন্তু সুব্যবস্থা পূর্ব্বক তাহার সদ্ব্যয় করা অহল্যাবাইয়েরই কার্য্য ছিল। কর্ম্মচারিগণ অহল্যার আদেশ ভিন্ন কোনও কার্য্য করিতে পারিতেন না। মহ্লাররাও সৈন্য, সামন্ত সহ বাফ্‌গাও নামক স্থানে থাকিতেন। অহল্যাবাই রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন এবং আয়, ব্যয়ের হিসাব ও সৈন্যগণের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিতেন। প্রবাদ আছে যে, অহল্যা স্বহস্তে আয়, ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন এবং মহ্লার-রাও প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহা তাঁহাকে দেখাইতেন। মহ্লাররাওয়ের অপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে,

অথচ সুচারুরূপে, তিনি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যে কর্ম্মচারিগণেরও অপেক্ষা অহল্যাবাইয়ের অধিকতর দক্ষতা দৃষ্ট হইত। পুত্র-বধূর বুদ্ধির ও অভিজ্ঞতার উপর মহ্লাররাওয়ের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, পাণিপথ যুদ্ধে গমনের সময়ে, তিনি তাঁহারই উপর রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়া গিয়াছিলেন।

মহ্লাররাও, উগ্রপ্রকৃতি বশতঃ, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, কখনও কোন গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অহল্যাবাই ভিন্ন আর কেহই হিতকর পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেন না। শ্বশুরের জীবদ্দশাতেই তিনি রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রভূত ক্ষমতার অধিকারিণী হইলেও, ধন ও প্রভুতার সহচর অহঙ্কার কখনও অহল্যার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাজকার্য্য সম্পাদনের পর, অধিকাংশ সময়ই, তিনি নর্ম্মদাতীরে বাস করিয়া "স্নান, সন্ধ্যা, সদাচার ও দান-ধর্ম্মে" অতিবাহিত করিতেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৭২ বৎসর বয়সে, মহ্লাররাও হোল্‌কর পরলোক গমন করেন। মহ্লাররাওয়ের মৃত্যুর পর

তদীয় পৌত্র, অহল্যার পুত্র, মালেরাও রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ম্যালেরাও রাজকার্য্যে নিতান্ত অপটু ও অতিশয় অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। সুতরাং পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেও, রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার, প্রকৃত প্রস্তাবে, অহল্যাবাইয়েরই স্কন্ধে পতিত হইয়াছিল। যতদিন তাঁহার শ্বশুর জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজ্য-ভার তাঁহার নিকট তাদৃশ দুর্ব্বহ প্রতীয়মান হয় নাই। রাজকার্য্যে শ্বশুরের সহায়তা করিলেও তিনি, ব্রতধর্ম্মে ও পুত্রকন্যাদিগের প্রতিপালন-সুখে, অপেক্ষাকৃত শান্তিতে, জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু মহলাররাওয়ের মৃত্যুর সঙ্গেই, রাজ্যপালন যে কিরূপ দুরূহ কার্য্য, তাহা তিনি সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব পরীক্ষিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

মহলাররাও কিরূপ অবস্থায় রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা উপক্রমণিকায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাহুবলে যাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি নিজের গৌরবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার উপর জাতক্রোধ ছিলেন, এবং মহলাররাওয়ের মৃত্যুর পর ইহার প্রতিবিধান করিবেন, মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সুতরাং শ্বশুরের মৃত্যুর পর কুলবধূ অহল্যাকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত্রুমণ্ডলীর মধ্যেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

বিপদ ও সঙ্কটই মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরীক্ষা-ক্ষেত্র। অহল্যাবাই যে কিরূপ মনস্বিনী ছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহার সাংসারিক ও রাজনৈতিক সকল প্রকার বিপদের ও দুর্ঘটনার আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা প্রথমে তাঁহার সাংসারিক বিপদের কথা বলিব। ভিখারিণীই হউন, আর "রাজরাণীই" হউন, স্বামীই রমণীর প্রধান অবলম্বন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অহল্যা স্বামিবিরহিতা হইয়াছিলেন। একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্বশুরও, তাহার পর, পরলোক গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং রাজপদের অধিকারিণী হইলেও, অহল্যাকে এই সকল বিপৎপাতে নিদারুণ মনোবেদনা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অপেক্ষা তাঁহার আরও একটী গুরুতর মানসিক অশান্তির কারণ ছিল। অহল্যার পুত্র, মালেরাও, জননীর শান্তির স্থল না হইয়া, তাঁহার হৃদয়ের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিলেন। পৃথিবীর মহাপুরুষগণের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সাংসারিক সুখে সুখী ছিলেন না। পিতা

ভ্রাতা, পত্নী, পুত্রের, কাহারও না কাহারও, ব্যবহারে তাঁহাদিগকে অশ্রুপাত করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সাধ্বী অহল্যারও জীবন ইহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। অহল্যার পুত্র মালেরাও অতি দুর্ব্বৃত্ত ও অসৎপ্রকৃতি ছিলেন। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে তরুণ বয়সেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়; কিন্তু তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার ব্যবহারে অহল্যাকে দিবারাত্রি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। অহল্যা আশা করিয়াছিলেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ও রাজত্বের ভার স্কন্ধে পড়িলে, মালেরাওয়ের স্বভাব, ক্রমে, পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই। মহ্লাররাওয়ের মৃত্যুর পর মালেরাও পিতামহের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার স্বভাবের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বরং অধিকতর নৃশংস ও উন্মত্তোচিত ব্যবহারে তিনি জননীকে মর্ম্মপীড়িত করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই মালেরাও বিকৃতমস্তিষ্ক, উগ্রপ্রকৃতি এবং একান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত মদ্যপান অভ্যাস করাতে তাঁহার হিতাহিত-জ্ঞান একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। মদিরামত্ত অবস্থায় তিনি অতি সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীদিগকেও বেত্রাঘাত করিতেন।

হল্লাররাওয়ের পরম আত্মীয় ও বিশ্বাসভাজন তুকোজী-হোল্‌কর একবার তাঁহাকে উপদেশ দিতে যাইলে মালেরাও তাঁহাকেও ভৃত্য দ্বারা অপমানিত করাইয়াছিলেন। পতিবিয়োগের পর হইতে অহল্যা আপনার জীবন দেব-ব্রাহ্মণ-সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মালেরাও, জননীর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া, নানা প্রকারে তাঁহার ব্রতে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন। অহল্যা ব্রাহ্মণদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি কবিতেন; মালেরাও তাঁহাদিগকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেন, এবং যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে অপমানিত করিবার ও যন্ত্রণা দিবার জন্য তিনি, নিত্য, নূতন, নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন। কখনও পরিধেয় বস্ত্রের ও পাদুকার অভ্যন্তরে, গোপনে, তীক্ষ্ণবিষ বৃশ্চিক রাখিয়া দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিধান করিবার জন্য দান করিতেন। কখনও বা ধাতু-কলস রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া এবং তাহার ভিতর বিষধর সর্প রাখিয়া দিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিতে বলিতেন। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণ তন্মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে নির্ব্বোধ মালেরাওয়ের আনন্দের সীমা থাকিত না। অহল্যার করুণ হৃদয় পুত্রের এইরূপ দুর্ব্ব্যবহারে বিদীর্ণ হইত।

কিন্তু কি পাপে বিধাতা সেই নরপিশাচকে তাঁহার গর্ভে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি কেবল দিবারাত্রি অশ্রুপাত করিতেন এবং উৎপীড়িত-দিগকে উপযুক্ত পুরস্কারাদি দিয়া সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা করিতেন। নির্ব্বোধ মালেরাও, এইরূপ দুর্ব্ব্যবহারের ফলে, অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সিংহাসনে আরোহণের দশ মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। একবার তিনি রাজপ্রাসাদস্থ একজন শিল্পীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, আক্রোশবশতঃ, তাহার প্রাণবধ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাহার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, সে ব্যক্তি নিরপরাধ, বিনা দোষেই তাহার প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে। তখন মালেরাওয়ের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইল। দারুণ অনুতাপে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং রোগশয্যায় তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। লোকে বলিত যে, নিহত ব্যক্তি প্রেতসিদ্ধ ছিল, এবং সে মালেরাওকে, বিনা [illegible] তাহার প্রাণদণ্ড করিতে নিষেধ করিয়াছিল। মালেরাও, তাহার নিষেধ না শুনিয়াই, তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় মালেরাওয়ের সর্ব্বদাই এইরূপ মনে হইত যে, সেই নিহত শিল্পীর প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহার প্রাণনাশের উদ্যোগ করিতেছে। প্রেতযোনির অস্তিত্বে

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতীয় লোকেরই স্বল্পাধিক বিশ্বাস আছে; অহল্যারও ছিল। তিনি, আহার, নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, পুত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিতেন, এবং পুত্রের দেহ ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য, প্রেতাত্মার নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিন দিন ম্যালেরাওয়ের পীড়া বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। রোগের যন্ত্রণায় তিনি যে সকল প্রলাপবাক্য বলিতেন, তাহার অধিকাংশই সেই মৃত শিল্পীর হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, অন্যান্য সকলের ন্যায়, অহল্যারও মনে পুত্রের দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি, প্রেতাত্মার অধিষ্ঠানের জন্য, একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিলেন এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য জায়গীর দান করিতে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু প্রেতাত্মা কিছুতেই পরিতুষ্ট হইল না। অধিকাংশ সময়ই মালেরাওয়ের মুখ হইতে কেবল এইমাত্র কথা নির্গত হইত যে, "সে যখন নিরপরাধে আমায় বধ করিয়াছে, তখন তাহার প্রাণ না লইয়া আমি সন্তুষ্ট হইব না।" সুতরাং অহল্যা ক্রমশঃ পুত্রের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ্বাস হইলেন। হতভাগ্য মালেরাও, কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পর, সেই পীড়াতেই

প্রাণত্যাগ করিলেন।* তাঁহার পত্নীদ্বয় তাঁহার সঙ্গে সহমৃতা হইলেন।

এইরূপে স্বামীর, শ্বশুরের এবং পুত্রের মৃত্যুতে অহল্যাবাই, একে একে, কিরূপ সাংসারিক বিপদে পতিত

* মধ্যভারত ও মালবদেশের ইতিবৃত্ত লেখক সারজন ম্যালকম লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন যে, পুত্রের দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া, অহল্যা নিজেই যাহাতে মালেরাওয়ের সত্বর মৃত্যু হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যতদূর অনুসন্ধান করিযাছি তাহাতে এই জনশ্রুতি যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইযাছি। এ সম্বন্ধে এই মাত্র সত্য যে, পুত্রের দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত ও তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া, অহল্যা তাঁহার মৃত্যু এক প্রকার ঈশ্বরানুগ্রহ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন।"

The avowed sentiments of his wickedness and incapacity for government, had given rise to a report, that this admirable woman hastened the death of her own offspring. Every evidence proves this to be false, and his death is referred by all, that have been interrogated, (and among them many were on the spot when it occurred) to the same cause.

ইহার পাদ-টীকায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—I have no doubt that she was led by horror at his cruel acts of insanity, and a despair of his recovery, to look upon his death as a fortunate event for him, herself and the country ; but such a feeling is an honour, instead of a disgrace to her character. Page 301.

হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার রাজনৈতিক বিপদ তাঁহার সাংসারিক বিপদ অপেক্ষা লঘুতর হয় নাই। মহ্লাররাওয়ের মৃত্যুর পর অহল্যার দান-ধর্ম্মে ও দেব-ব্রাহ্মণ-সেবায় স্বাভাবিক অনুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পুত্রের ও পুত্রবধুদ্বয়ের লোকান্তর প্রাপ্তিতে, কষ্টবহুল রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক, জীবনের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করিবার জন্য তাঁহার বাসনা জন্মিয়াছিল এবং তদনুসারে তিনি তুকোজী হোলকর নামক মহ্লাররাওয়ের একজন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ও প্রিয়তম সেনাধ্যক্ষের উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে, বোধ হয়, অহল্যার প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশিত হইত না; সেই জন্য, বিধাতার বিধানে, এক অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা অহল্যার শান্তিপ্রয়াসী হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল।

অহল্যার শ্বশুর মহ্লাররাওয়ের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ, বিগ্রহে অতিবাহিত হইত। কখন সিন্ধুনদের উপকূলে, কখনও অযোধ্যা বা রোহিলখণ্ডের সন্নিকটে, কখনও বা রাজপুতনার মরুময়প্রদেশে, তিনি বৎসরের অধিকাংশ কাল যাপন করিতেন। এক স্থানে বসিয়া রাজকার্য্য

পর্য্যালোচনা করিবার অবসর তাঁহার ঘটিত না। নিজের প্রবাসকালে রাজকার্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি গঙ্গাধর-যশোবন্ত নামক একজন ব্রাহ্মণকে আপনার প্রধান মন্ত্রী বা দেওয়ানরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর যশোবন্ত অতি কূটবুদ্ধি ও স্বার্থপর পুরুষ ছিলেন। মালেরাওয়ের মৃত্যুর পর, অহল্যাকে অপসারিত করিয়া, নিজের প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য, তিনি একটী অতি ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যার ভরণ পোষণের জন্য কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া তিনি হোলকর-বংশীয় কোন শিশুকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অহল্যা যেরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাশালিনী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তাহাতে গঙ্গাধর যশোবন্ত মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি রাজ্ঞী হইলে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব একবারেই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে; আজ্ঞাবহ ভৃত্যের অপেক্ষা তাঁহার অধিক স্বাধীনতা থাকিবে না; কিন্তু অহল্যাকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া একটী বালককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। পাছে বুদ্ধিমতী অহল্যা, তাঁহার অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতা না হন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহারই ন্যায় আরও দুই এক জন

ধর্ম্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে লইয়া একটী কুচক্র গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। যে কোন সমাজই হউক, তাহাতে স্বার্থপর ও অধার্ম্মিক লোকের অভাব কখনও দৃষ্ট হয় না। গঙ্গাধর অল্প দিনের মধ্যেই [illegible] মনোমত এক ব্যক্তিকে সহকারীরূপে প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় যিনি মহারাষ্ট্রীয় সমাজের নেতারূপে পেশওয়ে পদে অধিরূঢ় ছিলেন, তিনি নিজে অতি ধার্ম্মিক, দূরদর্শী এবং ন্যায়বান পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য, রঘুনাথ রাও বা রায়োবাদাদা, তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত গুণবিশিষ্ট ছিলেন। পাপিষ্ঠ রঘুনাথের নাম ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত। এই কুলাঙ্গারেরই জন্য প্রথম মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং ইনিই স্বজাতির সর্ব্বনাশের পথ প্রথম উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। অহল্যাকে শোকার্ণবে নিমগ্ন ও রাজবাটীর অপর সকলকে নিরাশাপীড়িত দেখিয়া গঙ্গাধর রাঘোবাদাদাকে, হোলকর রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইবার জন্য, এক পত্র প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রের মর্ম্ম এইরূপ;—

"এখানকার রাজ্য এক্ষণে উত্তরাধিকারীশূন্য হইয়াছে। আপনি যে সুভেদারের পুত্র স্থানীয় ছিলেন, * তাহা

* রাঘোবাদাদার পিতামহ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বালাজীবিশ্বনাথের সময় মল্লারারাও পেশওয়েগণের অধীনে কার্য্য করিতেন বলিয়া

সর্ব্বজনবিদিত। আপনি, এই সময়ে, শীঘ্র আসিয়া, এই রাজ্য ও ধন, সম্পত্তি হস্তগত করুন্। এখানে সকলেই শোকে অভিভূত ও দুঃখসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। আপনি এ সময় আসিতে না পারিলে, রাজ্য আক্রমণের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুযোগ আর প্রাপ্ত হইবেন না।"

রাঘোবা, এই প্রস্তাবে সম্মতি ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া, গোপনে হোল্‌কররাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি যে গঙ্গাধরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অহল্যার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে সংবাদ, প্রথমে, শিবাজী-গোপাল ও রাওজী-মহাদেব নামক অহল্যাবাইএর দুইজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর কর্ণগোচর হইল। কিন্তু অহল্যার সেই শোকাকুলিত অবস্থায় তাঁহার নিকট এই সংবাদ লইয়া যাইতে তাঁহাদিগের সাহস হইল না। তাঁহারা, মৃত সুভেদারের হরকুবাই ও উদাবাই নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক, সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন;—"সময় থাকিতে সাবধান না হইলে শেষে পথের কাঙ্গাল হইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া হরকুবাই ও উদাবাই, অহল্যার সমীপে উপস্থিত হইয়া,

রাঘোবা তাঁহাকে পিতৃব্য সম্বোধন করিতেন এবং মহলাররাও নিজেও রাঘোবাকে ভ্রাতুষ্পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

আমূল বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। অপর কেহ হইলে এরূপ সংবাদে কিংকর্ত্তব-বিমূঢ় হইয়া পড়িতেন, কিন্তু অহল্যা, শ্রবণমাত্র প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া, শোক সম্বরণ পূর্ব্বক, তেজস্বিতার ও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণদ্বয় (গঙ্গাধর ও রাঘোবা) কৃতঘ্নতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাকে কেহও সামান্যা নারী মনে করিবেন না। আমি হস্তে বল্লম লইয়া দণ্ডায়মান হইলে পেশওয়ের সিংহাসনও বিকম্পিত হইবে। আমার শ্বশুর, স্বর্গীয় সুভেদার, তরবারিসহ শরীরক্ষয় করিয়া, বহুকষ্টে, এই রাজ্য-সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন; তোমামোদের বলে করেন নাই। আমরা শিলেদার (সিল্লিদার)। * স্বর্গীয় মহারাজ যেরূপ ভাবে শ্রীমন্তদিগের (পেশওয়েগণের) সেবকত্ব করিয়া গিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ ভাবে সেবকত্ব করিতে প্রস্তুত আছি (ক)। সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমরা মোগলগণের বা ফিরিঙ্গী-

---

* যাহারা স্বীয় অশ্ব লইয়া অপরের অধীনে সৈনিকের কার্য্য করে, তাহাদিগকে শিলেদার বলে। এখানে "শিলেদার" অর্থে "যুদ্ধোপজীবী।"

(ক) মহলাররাও পেশওয়েগণকে দিগ্বিজয় ও বিদ্রোহদমনাদি কার্য্যে সহায়তা করিতেন।

গণের (খ) অধীনে কার্য্য করিব—অথবা যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব। কিন্তু তাঁহারা যদি সুভেদারের রাজ্য ও ধনসম্পত্তি গ্রহণের চেষ্টা করেন, তবে কখনই সে চেষ্টা ফলবতী হইতে দিব না।” অহল্যা, সর্ব্ব-সমক্ষে এইরূপ তেজোগর্ভ বাক্য বলিয়া,পরে, কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে আহ্বানপূর্ব্বক, মৃদুস্বরে বলিলেন;—“অদ্যই ভোঁস্‌লে, গায়কওয়াড় (গুইকুমার) ও সেনাপতি দাভাড়ে প্রভৃতি মারাঠা মাণ্ডলিক নরপতিগণের নিকট, সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিয়া, গুপ্তপত্র প্রেরণ কর; এবং তুকোজীরাও হোল্‌করকেও ইন্দোরে আনয়নের জন্য উদয়পুরে দূত প্রেরণ কর। যাহাতে মন্ত্রভেদ না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে।”

মারাঠা মাণ্ডলিক নরপতিগণকে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—“কৈলাশবাসী সুভেদার, স্বয়ং ভিত্তি খনন করিয়া, স্বহস্তে ইষ্টক স্থাপন পূর্ব্বক, পেশওয়ে-সাম্রাজ্যরূপ এই বিশাল অট্টালিকা পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দৈবদোষে ঈশ্বর আজ আমাদের প্রতি বিরূপ। এইরূপ সঙ্কট সময়ে পূর্ব্বোপকারী আশ্রিতগণকে আশ্বাস-প্রদান ও তাহাদিগের জায়গীর রক্ষা পূর্ব্বক

(খ) পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগণ তৎকালে ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত ছিলেন।

তাহাদিগের নিকট হইতে সেবা-গ্রহণ করা শ্রীমন্তদিগের (পেশওয়েগণের) কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা পাপ বাসনাকে মনে স্থান দিয়াছেন, এবং আমাদিগের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন। আমাদিগের ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু অদ্য আমরা যেরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়াছি, সময় বিশেষে, আপনাদেরও সেইরূপ সঙ্কটে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমাদিগের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাইবেন।"

রাঘোবা দাদা ও গঙ্গাধর যশোবন্ত যে, অধর্ম্ম পূর্ব্বক, অহল্যাকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয় সামন্তগণের মধ্যে অনেকেই অহল্যার পক্ষ সমর্থনের জন্য স্বীকৃত হইলেন। অহল্যার আমন্ত্রণে গায়কওয়াড় (গুইকুমার) বিংশতি সহস্র সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। জন্নুজী ভোঁসলে সসৈন্যে নর্ম্মদা তীরস্থ হুসঙ্গাবাদে ছিলেন; তিনিও অহল্যাকে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। অপরাপর মাণ্ডলিক নরপতি ও সর্দ্দারগণও,

"মহ্লারজী হোল্‌কারের নিকট উপকৃত নহে, এমন ব্যক্তি এদেশে কে আছে? আবশ্যক হইলে আমরা আপনার নিকটেই আছি, জানিবেন!" গঙ্গাধরের ও রাঘবের পাপ-মন্ত্রণা হইতে আত্মরক্ষার জন্য অহল্যা পেশওয়ে মাধবরাও ও তাঁহার সুশীলা পত্নী রমাবাইকেও পত্র লিখিয়াছিলেন। * অহল্যার প্রতি অবিচার হইতেছে বুঝিয়া তাঁহারা উভয়েই তাঁহাকে রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মাধবরাও অহল্যার পত্রের উত্তরে অহল্যাকে লিখিয়াছিলেন :—

"তোমাদের রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে যাহার মনে পাপাভিলাষ উদয় হইবে, তোমরা তাহাকে নিঃসঙ্কোচে দণ্ড দিতে পার। আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।

---

* এই সময় হইতে রমাবাইয়ের সহিত অহল্যার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বদা পরস্পরকে পত্র লিখিতেন। মাধব দুর্মোচ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলে অহল্যা তাঁহাকে দেখিতে পুনায় গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে রমাবাইএর সহিত পারিবারিক এবং রাজ্যসংক্রান্ত নানা বিষয়ে অহল্যার কথোপকথন হইয়াছিল। রাঘোবা ও তাঁহার পত্নী আনন্দবাইএর ব্যবহারে যে পেশোয়া বংশের এবং পরিণামে সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় জাতির সর্ব্বনাশ হইবে, রমাবাই তাহা অহল্যাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং সে সর্ব্বনাশ দর্শনের পূর্ব্বে স্বামীর সহিত সহমৃতা হওয়াই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তোমার রাজ্যভার গ্রহণ যে আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত; তাহার প্রমাণার্থ তোমার দুই জন কর্ম্মচারীকে প্রতিনিধি দূত-স্বরূপ আমার রাজসভায় পাঠাইয়া দিবে।"

এদিকে তুকোজীরাও হোল্‌কর, পত্র প্রেরণের ষষ্ঠ দিবসেব অপরাহ্নে, উদয়পুর হইতে ইন্দোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র অহল্যাবাই তাঁহাকে সাদরে "অভ্যঙ্গ স্নান" করাইয়া "অভিষেক-বসন" প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন; এবং সেই দিনই তাঁহাকে এক প্রহর রাত্রের মধ্যে সৈন্যসহ ইন্দোরের বহির্ভাগে "গাড়রা খেড়ী" নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ দান করিলেন। এই সকল কার্য্য এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল যে অহল্যাবাই তৎ-সম্বন্ধে কাহারও পরামর্শ লইবার বা শুভক্ষণ নির্ণয় করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। সেনাপতি দাভাড়ে ও গায়কওয়াড়, তাঁহার সাহায্যের জন্য, যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি, রাজকোষ হইতে তাহাদিগের ব্যয়োপযোগী অর্থ প্রদান পূর্ব্বক, রাঘোবা দাদাকে বাধাদিবার জন্য, তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা দিলেন। কুলবধূ হইয়াও অহল্যা, যুদ্ধ-সঙ্কটে অভ্যস্ত সৈনিক পুরুষের ন্যায়

ক্ষিপ্রতার ও শৃঙ্খলার সহিত এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এদিকে সকল অনিষ্টের মূল গঙ্গাধর, অহল্যার দৃঢ়তা দেখিয়া, রাঘোবা দাদাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পতিপুত্রহীনা একজন বিধবা যে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিবে, রাঘোবা তাহা কখনও চিন্তা করেন নাই। বিশেষতঃ অহল্যা তাঁহাদিগের বংশের পূর্ব্বতন ভৃত্য মহলার-রাওয়ের পুত্রবধূ বলিয়া রাঘোবার তাঁহার প্রতি একটু অবজ্ঞার ভাব ছিল; সুতরাং অহল্যার ঔদ্ধত্য দমন করা রাঘোবাদাদার প্রতিপত্তি রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইল। তিনি সাড়ম্বরে সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গঙ্গাধরের ব্যবহারে অনেকেই তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং অহল্যা প্রায় সকলেরই সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন। হোল্‌করের সৈন্যগণ মহা উৎসাহে ও আনন্দে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। অহল্যা, স্বয়ং তাহাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। বাণপূর্ণ তূণ ও ধনু সঙ্গে লইয়া তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বীরাঙ্গনা-যোগ্য সাহস দর্শন করিয়া শত্রু, মিত্র সকলেই বিস্মিত হইলেন। অহল্যা, রাঘোবার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমন্ত মধুরাও (মাধবরাও) পেশোয়াকে রাঘোবার ব্যবহার জ্ঞাপন করিয়া, পূর্ব্বেই

পত্র লিখিয়াছিলেন; এক্ষণে রাঘোবাকেও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি বীরপুরুষ, আমি রমণী; আমার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলে আপনার গৌরব হইবে না, কিন্তু পরাজিত হইলে অগৌরব হইবে। এ যুদ্ধে আপনার লাভ কি?" অহল্যার সমরসজ্জা ও নির্ভীকতা দেখিয়া, রাঘোবা এ কথার অর্থ বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য সহসা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। তিনি গঙ্গাধর যশোবন্তকে সঙ্গে লইয়া প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য-সহ ইন্দোর আক্রমণ মানসে, সিপ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তুকোজী রাও-হোল্‌কর, "মাতুশ্রী অহল্যাবাইয়ের" চরণ বন্দনা পূর্ব্বক, রাঘোবাকে বাধা দিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তিনি, সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত "কুচ" করিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, সিপ্রা তীরে উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী এক গিরি-সঙ্কটে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরদিন রাঘোবার সৈন্যগণ সাড়ম্বরে সিপ্রা উত্তীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তুকোজীরাও তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "সিপ্রা উত্তীর্ণ হইলেই তরবারী হস্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব; অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইবেন।"

তুকোজীর প্রেরিত এই সগর্ব্ব উত্তর শ্রবণ করিয়া রাঘোবা চিন্তিত ও ভীত হইলেন। অহল্যাবাইয়ের সমর-সজ্জা ও সাহস দর্শন করিয়া তাঁহার "বীরশ্রী" নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়াছিল। অহল্যাবাইকে বশীভূত করা পূর্ব্বে যেরূপ সহজ বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সেইরূপ অসাধ্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। বিশেষতঃ এই কার্য্যে "শ্রীমন্তের" অর্থাৎ পেশওয়ে মাধব-রাওয়ের সম্মতি ছিল না। রাঘোবার কার্য্যের জন্য তিনি নিজেই দায়ী, মাধব রাও তাঁহাকে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সুতরাং অহল্যার বিরুদ্ধাচারণ করিতে রাঘোবার আর সাহস হইল না। মহ্লাররাও-কৃত উপকার স্মরণ করিয়াও তিনি, স্বীয় ব্যবহারের জন্য, কিয়ৎ পরিমাণে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় পাপ উদ্দেশ্য গোপন রাখিবার জন্য, রাঘোবা, কপটতা পূর্ব্বক, তুকোজী রাও হোল্‌করকে বলিয়া পাঠাইলেন যে,—মালেরাওবাবা লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া, আমরা পুত্রশোককাতরা অহল্যাবাইকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। তোমরা, বিপরীত বুঝিয়া, নিরর্থক যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছ কেন?" তুকোজীরাও, রাঘোবার এই চাতুরীপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন,—"যদি কৃপা-পরবশ হইয়া অহল্যার সান্ত্বনার জন্যই আপনি

করিয়াছেন, তবে এত সৈন্য, সামন্ত লইয়া আসিবার প্রয়োজন কি?" এই কথায় রাঘোবা বুঝিতে পারিলেন যে, তুকোজীর মনের সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। তখন তিনি, এক শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক, দশ, বার জন মাত্র সর্দ্দার লইয়া, হোল্‌করের শিবিরে গমন করিলেন। তুকোজীও তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য, পদব্রজে শিবিরের বাহিরে আসিয়া, যথাবিধি তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরে উভয়েই মালেরাওয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

সেই দিনই রাঘোবা, স্বীয় সৈন্য, সামন্তগণকে উজ্জয়িনীতে রাখিয়া, কয়েক জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে, তুকোজীর সহিত ইন্দোরে গমন পূর্ব্বক, অহল্যাবাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। অহল্যাবাই স্বীয় প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী একটী অট্টালিকা রাঘোবার জন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাঘোবা সেখানে প্রায় এক মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। সেই এক মাসের মধ্যে চার পাঁচ বার "সেবা ও সেবকের কর্ত্তব্য ও সম্বন্ধ" বিষয়ে অহল্যার সহিত তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল। কিন্তু মহ্লার রাওয়ের সময় হইতেই অহল্যা রাজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত পুণ্য দ্বারা তিনি এরূপ শক্তি-

লাভ করিয়াছিলেন যে, বিচার, বিতর্কে কেহ তাঁহাকে সহজে পরাস্ত করিতে পারিত না। রাঘোবা, "পুণ্যজ্যোতি-বিমণ্ডিতা" অহল্যাবাইয়ের সহিত বিতর্কে জয় লাভ করিতে না পারিয়া, তুকোজীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন। *

গঙ্গাধর ও রাঘোবা, আপনাদিগের ক্রূর অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য, সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন যে, অহল্যা যতই বুদ্ধিমতী ও কার্য্যপারদর্শিনী হউন, তথাপি তিনি রমণী। কোন সক্ষম পুরুষের হস্তে কার্য্যভার না থাকিলে চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে মহলাররাওয়ের ত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইবে; সেই জন্যই

* বখরকারের লেখার ভাবে বোধ হয় যে, রাঘোবা অহল্যার সহিত স্বামি-শূন্য হোলকর রাজ্যের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক, যাহাতে হোল্‌কর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে পেশওয়েগণের সাহায্য গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে কৌশলে অহল্যাকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শিনী অহল্যা, তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতা হন নাই; তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে তাঁহার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন। কাজেই রাঘোবা নিরুপায় ও বিফল-মনোরথ হইয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তাঁহারা অহল্যার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অহল্যাবাই নিজেও বুঝিতেন যে, বিষয়-কার্য্য সম্পাদনে সক্ষমা হইলেও, তিনি নারী; সুতরাং নারীজনোচিত কার্য্যই তাঁহার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। * কার্য্য-সম্পাদনের সুবিধাব জন্য তিনিও কোন সক্ষম পুরুষেব সাহায্য-গ্রহণে অনভিলাষিণী ছিলেন না। তবে রাঘোবা অথবা গঙ্গাধর যশোবন্ত যে, তাঁহার অধিকাবে অসঙ্গত হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহাতেই তাঁহাব আপত্তি ছিল এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহাদিগেব কার্য্যের প্রতিবাদ কবিয়া, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যুদ্ধা-

---

* গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, এই সময়ে রাঘোবা কথা প্রসঙ্গে অহল্যাকে দত্তক-পুত্র গ্রহণের জন্য অনুবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অহল্যা সে প্রস্তাবে সম্মতা না হইযা বলিযাছিলেন,—"অল্প বয়স্ক বালককে দত্তক গ্রহণ করিলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার স্বভাব কিরূপ হইবে ও সে কতদূর কার্য্যদক্ষ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। এই কারণে রাজ্যশাসনক্ষম কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার প্রদান করাই, আমি অধিকতর সঙ্গত মনে করি।" এই জন্যই অহল্যাবাই প্রাপ্তবয়স্ক তুকোজী হোল্‌করকে, পুত্রস্থানীয় করিয়া, তাঁহার হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা রঘুনাথ যে, কোন বালকের হস্তে হোল্‌করবাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক, স্বয়ং কর্ত্তা হইবেন ভাবিয়াছিলেন, সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল।

ভুষ্বর শেষ হইলে তিনি নিজের নির্ব্বাচিত সেনাপতি ও কার্য্যাধ্যক্ষ তুকোজী হোল্‌করের উপর রাজ্য-পালনের ভার প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। সন্ধি, বিগ্রহাদি কঠোরতর কার্য্যসমূহের ভার তুকোজীর হস্তে সমর্পিত হইল। কিন্তু দেব-পূজা, ব্রাহ্মণ-সেবা, অতিথি-পালন প্রভৃতি সাত্বিক কার্য্যসমূহ অহল্যা নিজের হস্তেই রাখিলেন। একদিকে তাঁহার হৃদয় যেমন কোমল ছিল, অপরদিকে তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধিও তেমনই প্রখর ছিল। অভিমানী রাঘবকে নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া, তিনি তাঁহাকে এরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতি রাঘোবার বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইয়াছিল। শ্বশুরের পুরাতন ভৃত্য বলিয়া অহল্যা ষড়যন্ত্রী গঙ্গাধরেরও অপরাধ ক্ষমা পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। নিজের অকৃতজ্ঞ আচরণ এবং অহল্যার সদয় ব্যবহার স্মরণ করিয়া গঙ্গাধর, পরিণামে, অনুতপ্ত চিত্তে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাছে তাঁহার নিজের মনোনীত কার্য্যাধ্যক্ষ তুকোজীকে সাধারণে সম্মান না করেন, এই আশঙ্কায় অহল্যা তাঁহাকে রাঘোবার সহিত মহারাষ্ট্র-রাজধানী পুনায় পেশোয়ার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মোগল বাদসাহগণের প্রকৃত প্রভুত্ব হ্রাস পাইলেও স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণ যেমন তাঁহা-

দিগকেই ভারতের প্রভু বলিয়া সমাদর করিতেন, সিন্ধে, হোল্‌কর, ভোঁসলা প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সামন্তগণও, কার্যতঃ স্বাধীন হইলেও, তেমনই পেশোয়াকেই মহারাষ্ট্রীয় চক্রের নেতা বলিয়া সম্মান করিতেন। পেশওয়ে মাধবরাও, তুকোজীর নিয়োগে অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও নিযুক্তিপত্র প্রদান করিলেন; সুতরাং অহল্যার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তির কারণ রহিল না। রক্তপাত ও প্রাণিহত্যা না করিয়া রাজ্ঞী অহল্যা এইরূপে অরাতিদিগকে দমন ও হোল্‌কর রাজ্যের স্থিতিসাধন করিলেন।

রাঘোবা, ইন্দোর পরিত্যাগ করিয়া, পুনায় গমন করিলে অহল্যাবাই নিজের সাহায্যার্থ সমাগত ভোঁসলে, গায়কওয়াড় প্রভৃতি মারাঠা সর্দ্দারগণকে ও তাঁহাদের অনুযাত্রী প্রায় দেড় সহস্র প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে ভোজনার্থ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনান্তে তিনি, সকলকে যথাযোগ্য বস্ত্র, ভূষণাদি প্রদান পূর্ব্বক, কৃতজ্ঞতা প্রকাশক ও সদ্ভাব-বর্দ্ধক বাক্য দ্বারা আপ্যায়িত ও গৌরবান্বিত করিয়া বলিলেন,—"এই সঙ্কটকালে আপনারা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, আমাদের সাহায্য ও উপকার করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা পাইলাম; আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে অপনাদিগের

ব্যবহার স্মরণ করিব।” অহল্যাবাই কর্ত্তৃক এইরূপে সংকৃত ও সম্মানিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় সামন্তগণ স্ব, স্ব দেশে প্রতিগমন করিলেন।

এই ঘটনায় অহল্যা যেরূপ মানসিক বল, বুদ্ধি, প্রভাব, বিনয়, এবং কৃতজ্ঞতাদি গুণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর ও বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের অধিপতিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার বন্ধুত্ব লাভের জন্য, এবং তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণের সংবাদে আনন্দ প্রকাশের জন্য, তাঁহাকে নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। অহল্যাবাইও তাঁহাদিগের উপঢৌকনের প্রতিদানে উপযুক্ত উপায়নাদি প্রেরণ দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্ত মাধব রাওয়ের আদেশানুসারে অহল্যাবাই স্বীয় দেওয়ান্ নায়ো গণেশ (নারায়ণ গণেশ) ও শিবাজী গোপাল নামক অপর একজন কর্ম্মচারীকে তুকোজীরাও হোল্‌করের সহিত পুনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পেশওয়ের রাজসভায় উপস্থিত হইলে শ্রীমন্ত [illegible] অহল্যাবাই ও তুকোজীরাওয়ের বহুল প্রশংসা করিলেন। হোল্‌কর রাজ্যের জন্য পেশওয়ের একজন কার্য্যকারক প্রতিনিধি (Agent) নিযুক্ত করিবার কথা উত্থাপিত হইলে শ্রীমন্ত তাঁহাদিগকে বলিলেন, “এখান হইতে

কোনও ব্যক্তিকে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলে, তাহার সহিত তোমাদের মনের ও মতের মিল হইতে অন্ততঃ এক বৎসর লাগিবে। ইহার অপেক্ষা অহল্যাবাই আপনার অধীন কোনও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে আমাদিগের প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করিলে আমরা তাঁহাকেই আমাদের পক্ষ হইতে নিযুক্তিপত্র প্রদান করিব; তাহার দ্বারা উভয়পক্ষেরই কার্য্যের সুবিধা হইবে।" পরিশেষে অহল্যাবাইয়ের নির্দ্দেশ ক্রমে শ্রীমন্ত, শুভদিন দেখিয়া, নারো গণেশকেই স্বীয় কর্ম্মকারকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় অহল্যাবাইয়ের প্রতি মাধব রাওয়ের কিরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল, তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইবে।

এইরূপে গঙ্গাধর যশোবন্তের ষড়যন্ত্রের নিষ্পত্তি ও সমস্ত বিষয়ের সুমীমাংসা হইল। যে অবস্থায় অহল্যাকে এই সকল ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে তাঁহার দৃঢ়চিত্ততার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। একমাত্র পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে যখন তিনি [illegible] হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহাকে এই সকল রাজনৈতিক ঘূর্ণবায়ুর মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অপর [illegible] না; তাঁহার [illegible] শাস্ত্রানুসারে পিতামহের রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন না; তিনি নিজে রাজ্ঞী হইয়াও তপস্বিনীর ন্যায়

কঠোর বৈরাগ্যে দিনপাত করিতেন। প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা এবং ভোগসুখ, সাধারণতঃ, এই তিনেরই জন্য লোকে রাজ্যলালসা করিয়া থাকে। কিন্তু সংসারে অনাসক্ত-চিত্তা অহল্যার এই তিনের কোনটীরই প্রতি লালসা ছিল না। তিনি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়া রাজ-কার্য্য হইতে অপসৃতা হইলে রাঘোবাদাদা ও গঙ্গাধর যশোবন্ত তাঁহাকে সে বৃত্তি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে ও সসম্মানে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতে পারিত। অহল্যার প্রকৃতিও স্বভাবতঃ যেরূপ কোমল ছিল, তাহাতে, বিবাদ, বিসম্বাদ না করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে বৃত্তিভোগ ও ধর্ম্মাচরণ করাই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত মনে হয়। কিন্তু আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে ন্যায় ও সত্যের সম্মান রক্ষার জন্যই, মানসিক উদ্বেগ সত্বেও, তিনি অধর্ম্মাচারিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিবিদের ন্যায় কৌশলে ও বীরাঙ্গনার ন্যায় পরাক্রমে শত্রুদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখনই তাঁহার প্রভুশক্তি পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনই তিনি, তপস্বিনীজনোচিত বৈরাগ্যের সহিত, তাহা অপরের হস্তে বিন্যস্ত করিলেন। একদিকে নারীসুলভ কোমলতা ও অপরদিকে পুরুষোচিত কাঠিন্য তাঁহার প্রকৃতিতে যেরূপ সুন্দররূপে সম্মিলিত দেখিতে পাওয়া যায়, অতি
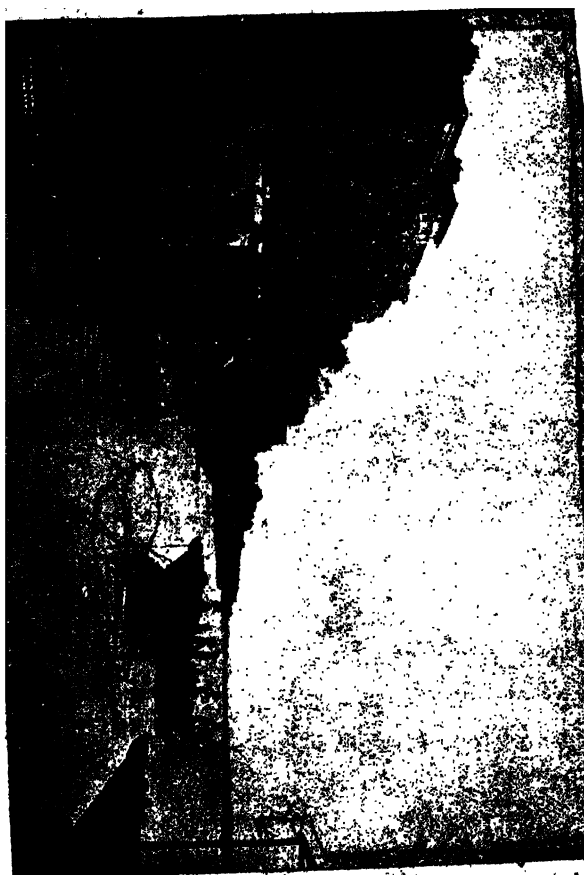
অল্প ঐতিহাসিক রমণীর মধ্যেই সেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার এক একটী কার্য্য আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার রাজশক্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন; সে শক্তি তিনি কিরূপে পরিচালিত করিয়াছিলেন, এইবার আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমরা বলিয়াছি যে, যতক্ষণ প্রয়োজন, অহল্যা পুরুষোচিত সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়া, আপনার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখী হন নাই। কিন্তু তিনি ভোগ-সুখের বা প্রভুত্বের অভিলাষিণী ছিলেন না। রাজ্যের কল্যাণের জন্য একজন পুরুষ সহযোগী আবশ্যক, ইহা বুঝিয়া তিনি, তুকোজীর হস্তে রাজ্যের পুরুষোচিত কার্য্যসমূহের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক, স্বয়ং নারীজনোচিত লঘুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুকোজী সাহসী, স্থির-প্রকৃতি এবং কর্ম্মক্ষম পুরুষ ছিলেন। অহল্যার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল। অহল্যাও তাঁহাকে আন্তরিক বিশ্বাস করিতেন। তুকোজী সন্ধি, বিগ্রহ এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য করিতেন; অহল্যা, তাঁহার সহায়তায় নিশ্চিন্ত হইয়া, প্রজাপুঞ্জের কল্যাণসাধনে ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজশক্তির বিভাগ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিবার সম্ভাবনা, অহল্যার এবং তুকোজীর মধ্যে সেরূপ কোন ভাব উৎপন্ন [illegible]

সুতরাং তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে, তুকোজীর হস্তে শাসনশক্তি সমর্পণ করিয়াছিলেন। তুকোজীও জানিতেন যে, অহল্যার ন্যায় রাজ্ঞীর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। সেই জন্য তিনিও, সকল বিষয়ে, সাধ্যানুসারে, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। অহল্যার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তুকোজী অহল্যাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন। অহল্যার মৃত্যুর পর তিনিই মহ্লাররাওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তুকোজীর বংশধরগণ এক্ষণে ইন্দোরে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহাদিগের আদিপুরুষ যে অহল্যার মনোনীত ও প্রীতিভাজন ছিলেন, তাহাই এক্ষণে তাঁহারা তুকোজীর সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন।

রমণী হইয়াও অহল্যা যেরূপ দৃঢ়তার ও দক্ষতার সহিত আপনার গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। হোল্‌কর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও শৃঙ্খলা তাঁহারই চেষ্টায় সাধিত হইয়াছিল। রাজসংসারের বিপুল সম্পত্তি অহল্যারই হস্তে সমর্পিত থাকিত। তিনি রাজ্যের আয়, ব্যয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার সুব্যবস্থার

সময়কার একটী প্রধান

সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। প্রজাগণের সুখ ও শান্তি অহল্যার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্যে যাহা সম্ভবপর, প্রজাগণের মঙ্গল সাধনের জন্য, তাহা করিতে তিনি কখনও ত্রুটী করিতেন না। এক্ষণে আমাদিগের দেশে যেরূপ অবরোধ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এরূপ ভাবে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। মহারাষ্ট্রীয়-গণ, ভারতের অন্যান্য জাতির ন্যায়, মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক কখনও সম্পূর্ণরূপে বিজিত হন নাই। সেইজন্য মুসলমান জাতির রাজনীতি ও সামাজিক প্রথা, অন্যান্য সমাজের ন্যায়, মহারাষ্ট্রীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই। অহল্যা, অবাধে, প্রকাশ্য রাজসভায় উপবিষ্ট থাকিয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তাঁহার অতি দরিদ্রতম প্রজাও, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনার সুখ, দুঃখ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতে পারিত। রাজ্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই, তিনি সমস্ত রাজ্যের ভূমির পরিমাণ করাইয়া, রাজস্ব সম্বন্ধে কতকগুলি সুনিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। অনেক রাজা, আয় বৃদ্ধির জন্য, প্রজাগণের ভূসম্পত্তি ছলে, বলে বা কৌশলে আত্ম-সাৎ করিয়া থাকেন; কিন্তু অহল্যার প্রজাগণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে যে স্বত্ব উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহাতে

তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রজাগণের সকল প্রকার আবেদন তিনি স্বয়ং স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এরূপ প্রবল ছিল যে, বিচারপ্রার্থীর আবেদন অতি সামান্ত হইলেও, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, তিনি কখনও কোন আজ্ঞা প্রদান করিতেন না। মধ্যভারতের ইতিহাস-লেখক স্যার জন ম্যালকম্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, কি জানি, হোল্‌কর বংশীয়গণের নিকট অনুসন্ধান করিলে, পাছে তাঁহারা পক্ষপাতিত্ব-বশতঃ অহল্যার সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রশংসা করেন, সেই জন্ত আমি, যতদূর সম্ভব, নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, যতই অনুসন্ধান করিয়াছি, অহল্যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ততই অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।*

রাজকার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া অহল্যা যত-টুকু সময় পাইতেন, তাহা ধর্ম্মানুশীলনে ও সৎকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সাংসারিক প্রত্যেক

* "although inquiries have been made among all ranks and classes, nothing has been discovered to diminish the eulogiums or rather blessings, which are poured forth wherever her name is mentioned. The more, indeed, enquiry is pursued, the more admiration is excited."

Malcolm's *Central India and Malwa*. Page 145.

কার্য্যের মূলে প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল। তিনি বলিতেন, "ঈশ্বর আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য আমি তাঁহার নিকট দায়ী।" অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইলে অহল্যার স্বভাবতঃ কোমল হৃদয় ব্যথিত হইত। তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বলিতেন, রাজত্ব করিতে হইলে এরূপ কোমলহৃদয় হওয়া উচিত নয়; দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন ভিন্ন কোন রাজ্য রক্ষা হয় না। মন্ত্রিগণের কথা যে সত্য, অহল্যা নিজেও তাহা বুঝিতেন; কিন্তু বুঝিলেও, কোমলতা বশতঃ, সকল সময়, মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন না। কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবার সময়, তিনি বলিতেন, "মরণ-ধর্ম্মশীল জীব হইয়া, সেই সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্ট কোন প্রাণীকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের একবার বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।"

সাধারণ রমণীগণ, বৃথা কার্য্যে ও অসার কথোপ-কথনে, অনেক সময়, অতিবাহিত করিয়া থাকেন; অহল্যা কখনও সেরূপ করিতেন না। নিরর্থক সময়ক্ষেপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের একটী পাণ্ডুলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি, প্রতিদিন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতেন।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর, তিনি নিয়মিতরূপে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ শ্রবণ করিতেন। সেই সময় তাঁহার দ্বারদেশে বহুসংখ্যক ভিক্ষুক সমাগত হইত। অহল্যা স্বহস্তে তাহাদিগকে ভিক্ষা দিতেন, এবং তাহার পর, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া, স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। নিজের পানাহার সম্বন্ধে তিনি অতি সদাচার-সম্পন্না ছিলেন। হোল্‌করবংশ মহারাষ্ট্রীয়-দিগের মধ্যে যে জাতির অন্তর্ভূত, তাহার বিধবাগণের পক্ষে মৎস্য-মাংসাহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু অহল্যা কখনও মৎস্য, মাংস স্পর্শ করিতেন না। এমন কি, বৈধব্যের পর তিনি কখনও কোন সুমিষ্ট দ্রব্য আহার করেন নাই বলিয়া প্রবাদ আছে। আহারের পর, সামান্য ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, তিনি রাজসভায় যাইয়া বসিতেন এবং সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপ রাজকার্য্য করিতেন। অপরাহ্নে সভা ভঙ্গ হইবার পর, অন্যূন তিন ঘণ্টাকাল, সায়ংসন্ধ্যা, পূজা ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইত। তাহার পর পুনর্ব্বার রাজকার্য্য আলোচনা করিতে বসিতেন। এইরূপে, দৈনিক সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইলে, রাত্রি প্রায় এগারটার সময়, তিনি শয়ন করিতেন। দেবপূজা, উপবাস, এবং রাজকার্য্য, এই তিন বিষয়ে তাঁহার কখনও আলস্য

বা ঔদাসীন্য লক্ষিত হইত না। মহারাষ্ট্র-দেশে যত প্রকার উৎসব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, সকল গুলিই তিনি অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিতেন। অনেকে কেবল সামাজিক রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই পূজা, পাঠাদি করিয়া থাকেন; কিন্তু অহল্যা সেরূপ করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রগাঢ় বিশ্বাসপূর্ণ ও ভক্তিমূলক ছিল। দেবতাবিশেষের পূজাই যে তাঁহার নিকট ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা নহে; দীন, দরিদ্রের সেবা, গুণিজনের সম্মাননা, রাজকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য, সন্ধি অথবা বিগ্রহ, সমস্তই, তাঁহার নিকট ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইত। কেহ কেহ মনে করেন যে, ধর্ম্মানুসরণ করিতে হইলে সাংসারিক কার্য্য করা হয় না এবং সাংসারিক কার্য্য করিতে হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যায় না। [illegible] এরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সংসারে থাকিলে [illegible] কোন কোন সময়ে এবং কোন কোন বিষয়ে, ধর্ম্মা[illegible]নের বিঘ্ন ঘটে, তাহা সত্য। কিন্তু যিনি, সাংসারিক কা[illegible] পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিপ্ত থাকিয়াও, ভগবৎ-পদারবিন্দ [illegible] না হন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, এবং সংসাররূপ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বিজয়ী বীর। অহল্যার প্রকৃতিতে [illegible] দেব-[illegible] গুণ বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই আমরা তাঁহাকে রমণী[illegible] আদর্শস্বরূপ মনে করি। ব্রত, পূজা, এবং উপবাস [illegible]

ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানে, যেমন, একদিকে, তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিষয়ালোচনাতে ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিও, তেমনই, অপরদিকে, তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ভোগ-সুখে বাসনা না রাখিয়া তিনি যেরূপ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।

রাজোচিত কর্ত্তব্য-সম্পাদন সকল সময়েই কঠিন; কিন্তু সময় ও অবস্থাবিশেষে তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিনতর হইয়া থাকে। অহল্যার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, সেই জন্য, তিনি যে সময়ে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। এখন ভারতবর্ষ যেরূপ শান্তি-সুখ ভোগ করিতেছে, অহল্যার সময়ে ইহার অবস্থা সেরূপ ছিল না। ইংরাজ-শাসনের গুণে দেশীয় রাজন্যবর্গ এক্ষণে আর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন না। হিমজীর্ণ বিষধরের ন্যায় তাঁহাদিগকে, বাধ্য হইয়া, শান্তভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু অহল্যার সময়ে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ মধ্য-ভারতের, অবস্থা অন্যরূপ ছিল। আফ্রিকার নিরন্তর বিষধর-হিংস্রজন্তু-সমাকুল অরণ্যানীর সহিত তাহার তুলনা করিলে, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। একদিকে [illegible] দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের, এবং অপর দিকে জাঠ,

রোহিলা, পিণ্ডারী প্রভৃতি নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়স্থ সৈনিক-দস্যুগণের উপদ্রবে মধ্য-ভারত তখন ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। এরূপ অবস্থায় অহল্যা যে আপনার রাজ্যে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। তাঁহার শাসনের এমনই গুণ এবং তাঁহার নামের এমনই প্রভাব ছিল যে, তাঁহার প্রতিবাসী, সমর-লোলুপ রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ কখনও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। একবার মাত্র উদয়পুরের রাণা, কয়েক সপ্তাহের জন্য, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু, অহল্যার প্রেরিত সেনাপতির নিকট পরাজিত হইয়া, তিনি সত্বরই সন্ধি-প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সভায় বিদেশীয় রাজগণের প্রেরিত যে সকল দূত অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে তাঁহার মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অহল্যারও প্রেরিত রাজদূত পুনা, হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপত্তন, নাগপুর, কলিকাতা প্রভৃতি সে সময়কার প্রধান, প্রধান রাজ-ধানীতে অবস্থিতি করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অহল্যার রাজ্যকালে সন্ধি, বিগ্রহাদির ভার তুকো-জীরই হস্তে সমর্পিত ছিল। সুতরাং তুকোজী, যে সকল

যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া, গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অহল্যার শাসনকাল যুদ্ধ, বিগ্রহাদির জন্য প্রসিদ্ধ নহে; প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। শাসনাধীন প্রদেশসমূহে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য তিনি স্বল্প মাত্রই সৈন্য রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার এমনই সুব্যবস্থা ছিল যে, সেই স্বল্প সংখ্যক সৈন্যেরই সাহায্যে তিনি, তাদৃশ সঙ্কট কালেও, স্বরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহাতে কেহ তাঁহার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি, যথাস্থানে, সৈন্য সন্নিবেশ করিতে অমনোযোগিনী ছিলেন না। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, শান্তিরক্ষার জন্য তাঁহাকে সৈন্যবলের অধিক আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। তাঁহার নাম ও ধর্ম্মভাবই তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট সৈন্যবলের কার্য্য করিত। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ "ভীম" ও "কান্ত" উভয় গুণের সম্মিলনকে প্রকৃত রাজ-লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অহল্যার চরিত্রে ইহা প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইত। সুশীল ও শান্ত-স্বভাব প্রজাদিগকে যেমন তিনি সস্নেহ ব্যবহারে পরিতৃপ্ত করিতেন; উগ্রপ্রকৃতি অবাধ্য প্রজাদিগকে কঠোর দণ্ডদানেও তেমনই তিনি পরাঙ্মুখী ছিলেন না। প্রজাগণের ন্যায় আশ্রিত জনেরও

প্রতি তিনি, প্রয়োজন অনুসারে, উপযুক্ত কঠোরতা বা কোমলতা প্রদর্শন করিতেন। উগ্র ও চপলপ্রকৃতি প্রভুর নিকট কার্য্য করা অপেক্ষা ভৃত্যের পক্ষে অধিকতর কষ্টকর আর কিছুই নাই। কিন্তু অহল্যা তাঁহার অনুজীবিগণের প্রতি এরূপ স্নেহবতী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট ন্যায়পরতার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এরূপ সমাদর ছিল যে, তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে কখনও মন্ত্রী পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের মধ্যেও ক্বচিৎ কখনও কাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

অহল্যার সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে ইন্দোর একটী সামান্য পল্লী মাত্র ছিল। তাঁহারই সময়ে ইহা সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। তাঁহার সুশাসন ও সদ্ব্যবহার-গুণে আকৃষ্ট হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে বণিকগণ সেখানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। নগরবাসিগণের উপর কেহ কোনরূপ অবিচার করিলে, তিনি যতই উচ্চপদস্থ হউন না, অহল্যা তাঁহাকে কখনও ক্ষমা করিতেন না। কথিত আছে যে, একবার তুকাজী লোকের প্ররোচনায় এবং প্রচলিত রাজ-নিয়ম অনুসারে কোন পরলোকগত, নিঃসন্তান বণিকের সম্পত্তি অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অহল্যা তখন ইন্দোরে ছিলেন না। তিনি মহেশ্বর-ক্ষেত্রে অবস্থান [illegible]

ছিলেন। বণিক-পত্নী, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলে অহল্যা, সবিশেষ শ্রবণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন এবং তুকোজীকে এরূপ উৎপীড়ন হইতে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। অহল্যার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে তুকোজীর সাহস হইল না। বণিক-পত্নীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল এবং ইন্দোরবাসিমাত্রই, এইরূপ ন্যায়পরায়ণতার জন্য, অহল্যাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হোল্‌কর-বংশের আশ্রিত সামন্তবর্গেরও সহিত অহল্যা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে ইহাঁদিগের সহিত রাজস্ব সম্বন্ধে কোনওরূপ সু-ব্যবস্থা ছিল না। যখন যেরূপ ইচ্ছা, উভয়পক্ষ, সুবিধা অনুসারে, সেইরূপ আদান, প্রদান করিতেন। তাহাতে উভয় পক্ষেরই নিরর্থক যথেষ্ট সময়ক্ষেপ ও বাদানুবাদ-জনিত অসন্তোষ ঘটিত। অহল্যা, এই অসুবিধা দূরী-করণার্থ, তাঁহাদিগের সহিত পরিতোষ-জনক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধনের ও কল্যাণ-বিধানের জন্য তিনি কোন উপায়ই অবলম্বনে পরাঙ্মুখী হইতেন না। বণিক, কৃষক এবং কুশীদোপজীবীদিগকে সমৃদ্ধিমান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

যাহাতে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গের উপর কোনরূপ অত্যাচার না করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। খণ্ডেরাও নামক তাঁহার কোন রাজস্ববিভাগীয় কর্ম্মচারীকে তিনি লিখিয়াছিলেন; "আপনি স্মরণ রাখিবেন, যথা সময়ে কর-সংগ্রহ অপেক্ষা আপনি প্রজাদিগকে সুখী করিতে পারিয়াছেন, জানিলেই আমি অধিক সন্তোষ লাভ করিব।"

অহল্যার সমকালে এমন অনেক দুরাচার নরপতি ছিলেন যে, তাঁহারা আশ্রিত প্রজাবর্গের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। পাছে রাজা জানিতে পারিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান, এই ভয়ে অনেকের প্রজাবর্গ আপনাদিগের ক্লেশার্জ্জিত অর্থ মৃত্তিকায় প্রোথিত বা কূপমধ্যে নিমজ্জিত রাখিতে বাধ্য হইতেন; স্বেচ্ছানুরূপ ব্যয়ে বা উপভোগে সাহস করিতেন না। অনেক রাজার রাজ্যে তখন অট্টালিকা-নির্ম্মাণ ও শিবিকারোহণ প্রভৃতি কার্য্য প্রজার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অহল্যা এইরূপ সময়ে যে, তাঁহার প্রজাবর্গের সঙ্গে মাতার ন্যায় সস্নেহ, বন্ধুর ন্যায় অনুকূল এবং ধর্ম্মাধিকরণের ন্যায় অপক্ষপাত ব্যবহার করিতেন, ইহা তাঁহার মহত্ত্বের বিশেষ পরিচায়ক। তাঁহার কোন প্রজা নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছে শুনিলে, তিনি তাহার প্রতি দ্বিগুণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

সকল বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। দেশ, বিদেশের গায়ক, পণ্ডিত, এবং শিল্পীদিগকে ইন্দোরে আমন্ত্রণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পুরস্কার দানে উৎসাহিত করিতেন। প্রজা-গণের ক্লেশার্জ্জিত অর্থে লালসা-প্রকাশ দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ দান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করি-তেন না। একবার তাঁহার রাজ্যের কোন স্থানে এক ধনী বণিক নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। অহল্যার কোন কর্ম্মচারী, বণিক-পত্নীর নিকট তিনলক্ষ মুদ্রা উৎকোচ প্রার্থনা করিয়া, তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়া-ছিলেন যে, উৎকোচ প্রদান না করিলে বণিকের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে। বণিক-পত্নী, আত্মীয়-গণের পরামর্শে, দত্তকপুত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু উৎপীড়ক কর্ম্মচারী সেই বালককে বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। বণিক-পত্নী তখন, নিরুপায়ে, অহল্যার শরণাপন্না হইলেন। অহল্যা, সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া, উৎপীড়ক কর্ম্মচারীকে তৎ-ক্ষণাৎ দূরীভূত করিবার আদেশ দিলেন এবং বণিক-পত্নী যে বালকটীকে দত্তক-পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে, মাতৃস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া, সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার ও সম্মানসূচক শিবিকা প্রদান পূর্ব্বক, বিদায় করিলেন। বণিক-পত্নী কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন

প্রদান করিতে চাহিলেন; কিন্তু অহল্যা তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না।

আর একবার তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে দুই ধনাঢ্য ভ্রাতা নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তাঁহাদিগের প্রচুর সম্পত্তি ছিল, অথচ কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার পত্নী, দত্তক-পুত্র গ্রহণ না করিয়া, স্বামীর ও দেবরের সম্পত্তি অহল্যাকেই প্রদান করিবার জন্য, তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। এরূপ স্বেচ্ছা-প্রদত্ত দান গ্রহণ করিলে অহল্যার পক্ষে যে কোন অপরাধ হইত না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নিঃস্বার্থহৃদয়া অহল্যা বিধবার সম্পত্তি গ্রহণে অস্বীকৃতা হইলেন। বিধবা বারম্বার অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন;—"যদি আপনার নিজের অর্থের কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে আপনি তাহা আপনার পরলোকগত স্বামীর স্মরণার্থ দেবসেবায় ও সাধারণের মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যয় করুন;—তাহা হইলেই আমি পরিতুষ্ট হইব।" অহল্যার পরামর্শানুসারে বিধবা আপনার সম্পত্তি নানাবিধ হিতকর কার্য্যে ও দেবমন্দির ইত্যাদি নির্ম্মাণে ব্যয় করিলেন। অহল্যার উদ্দেশ্য সার্থক হইল। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও নিঃস্বার্থতা সম্বন্ধে এইরূপ বহু সংখ্যক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। দত্তকপুত্রগ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া প্রজা-

বিষ্ণুপদ-মন্দির গয়া।

গণের নিকট উপঢৌকন গ্রহণ এদেশে সনাতন প্রথা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অহল্যা এরূপ উপঢৌকন-গ্রহণ অধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কথিত আছে যে, একবার কোনও ধনবান্ বণিকের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী, দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার প্রাপ্তির জন্য, অহল্যাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। অহল্যার কর্ম্মচারিগণ, বণিকপত্নীর এইরূপ স্বেচ্ছাদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে অহল্যাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। উপঢৌকন গ্রহণের অনুকূলে তাঁহারা এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, "বণিক্‌পত্নীর প্রচুর সম্পত্তি আছে; সুতরাং দত্তক-গ্রহণের জন্য রাজপ্রাপ্য কর প্রদান করিতে সে ন্যায়তঃ বাধ্য।" কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ ও যুক্তি শ্রবণ করিয়া অহল্যা বলিলেন, "আবেদনকারিণীকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা শাস্ত্র-সম্মত; সুতরাং তাহার নিকট হইতে কোনরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয় না। তাহার স্বামী পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে; স্বামীর উপার্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্যই বিধবা দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণই তাহাকে সে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা রাজা, সুতরাং

ক্ষমতাশালী ;—পাছে আমাদিগের বিনানুমতিতে দত্তক-গ্রহণ করিলে আমরা, শাস্ত্র-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, তাহার কার্য্যে বাধা দিই, এই ভয়েই সে আমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। অতএব তাহাকে এই বলিয়া অভয় প্রদান করা উচিত যে, "শাস্ত্রসম্মত কার্য্য করিতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে ; তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করিতে পার।" তাহাকে এইরূপ অনুমতি প্রদান করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এই অনুমতি প্রদানের জন্য যদি আমরা তাহার নিকট উপঢৌকন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিরুপায়ে সে তাহা দিতে পারে সত্য, কিন্তু এইরূপ গৃহীত উপঢৌকন চোরিত অর্থ হইতে বিভিন্ন নয় ; অথবা ইহাকে দস্যুতা দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। বণিক-পত্নীর নিকট হইতে উপঢৌকন গ্রহণ না করিয়া, তাহার আবেদনের উত্তরে এই মর্ম্মে তাহাকে অনুমতি-পত্র প্রদান কর যে, "তুমি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। পূর্ব্বের ন্যায় তোমার স্বামীর নাম ও সম্ভ্রম রক্ষা পূর্ব্বক তুমি তাঁহার উপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিতেছ শুনিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব। তোমার স্বামীর সম্পত্তির

তুমিই প্রকৃত অধিকারিণী; সুতরাং তোমার নিকট হইতে কোনও উপঢৌকন গ্রহণ করা হইল না। ভগবানের কৃপায় এইরূপ উপঢৌকন-গ্রহণ দ্বারা রাজকোষের ধন-বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা এখনও হয় নাই।” অহল্যার আদেশে কর্ম্মচারিগণ বিধবাকে উপরিউক্ত মর্ম্মে অনুমতিপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। বৈদেশিক লেখকগণের, এমন কি, আমাদিগের দেশেরও কাহারও কাহারও, ধারণা আছে যে, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারান্ধ হিন্দুরাজগণের অধীনে প্রজাগণের সুখ, শান্তি ছিল না। আমরা ইঁহাদিগকে অহল্যার ন্যায় হিন্দুরাজ্ঞীর শাসনকাল আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

অহল্যা রাজকার্য্য সম্বন্ধে এক দিকে যেমন মধুরতা প্রদর্শন করিতেন, প্রয়োজন হইলে, অপর দিকে, তেমনই কঠোরতাও অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাঁহার রাজ্যস্থ ভীল-দস্যুদিগের দমনে তিনি যথেষ্ট উগ্রভাব ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভীলগণ অহল্যার রাজ্যের নানা স্থানে ও মালবের আসন্নবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে বাস করিত। তাহাদিগের অত্যাচারে নিরীহ পথিকগণ, আপনাদিগের সম্পত্তি লইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতে পারিতেন না। ইংরাজ-রাজত্বেও এই ভীলদস্যুগণ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপ শাসিত হয় নাই। সুতরাং অহল্যার

সময়ে তাহাদিগের উপদ্রব যে কিরূপ প্রবল ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অহল্যা, প্রথমতঃ তাঁহার স্বাভাবিক কোমল ব্যবহার দ্বারা ভীলদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, তাহারা কোমলতায় পরিবর্ত্তিত হইবার পাত্র নহে, তখন তিনি অতি কঠোর দণ্ডবিধান দ্বারা তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। বহু সংখ্যক ভীল-দলপতি নিহত ও ভীল-গ্রাম উৎসন্ন হইলে ভীলদিগের চৈতন্য হইল, এবং তাহারা অহল্যার প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকার করিল। তাহাদিগকে পরাজিত ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া অহল্যাও করুণা-প্রদর্শনে বিরতা হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে দস্যুবৃত্তি ও মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের অপেক্ষা কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায় প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর পন্থা দেখাইয়া দিলেন। ভীলদিগের মধ্যে অনেক দিন হইতে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, প্রত্যেক পথিককে, তাহাদিগের অধিকৃত স্থান দিয়া যাইতে হইলে, কিঞ্চিৎ, কিঞ্চিৎ কর দিতে হইত। * অহল্যা তাহাদিগের পূর্ব্বাপর প্রচলিত

---

* এই কর "ভীল-কড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। স্থানভেদে উহার পরিমাণ বিভিন্ন। সাধারণতঃ, একটী বৃষ যত ভার লইয়া

তুাধিকার উচ্ছিন্ন করিলেন না। কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত অধিকার প্রদানের সঙ্গে এইরূপ নিয়মও প্রচলিত করিলেন যে, প্রত্যেক ভীল দলপতিকে তাঁহাদিগের শাসনাধীন প্রদেশে পথিকদিগের ধন ও প্রাণ রক্ষার জন্য দায়ী হইতে হইবে। অহল্যার এইরূপ যুগপৎ কঠোর ও কোমল ব্যবহারে দুর্দ্দান্ত ভীলগণ ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসিল।

অহল্যা ভারতবর্ষের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশেরও রাজন্য-গণের সহিত সর্ব্বদা সংবাদ ও পত্রাদি বিনিময় করিতেন। অন্যান্য রাজ্যের প্রজাবর্গের অবস্থা অবগত হইয়া, তাহাদিগের সহিত তুলনায়, নিজের প্রজাবর্গের সুখ, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য, তিনি সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন। হোল্‌কর রাজ্যের নানাস্থানে তিনি বহু সংখ্যক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গমনাগমনের সুবিধার জন্য তিনি বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উপর দিয়া একটী পথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পর্ব্বত এই খানে প্রায় লম্ব-ভাবে উত্থিত হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। হোল্‌কর রাজ্যের নানা স্থানে তিনি দেবমন্দির, পথিকদিগের জন্য বিশ্রামাগার;

মাইলে, গাড়ের, তৎপরিমাণ দ্রব্যের উপর, আধ পয়সার অধিক

এবং কূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহলাররাও, মৃত্যুকালে প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। * অহল্যা তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়াই, তাহার উপযুক্ত অংশ দান, অতিথিসেবা, এবং দেবপূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয়ের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকার্য্যে তিনি প্রায় কুড়ি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে, রাজকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ একত্র করিয়া, তিনি স্বহস্তে তাহার উপর অঞ্জলি-প্রমাণ গঙ্গাজল ও কতকগুলি তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিতেন। রাজপুরোহিত সেই সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করিতেন। তদবধি সেই অর্থ কেবলই ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় হইত; কস্মিন কালেও, তাহার এক কপর্দ্দক অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় হইতে পারিত না। তাঁহার এমন সুব্যবস্থা ছিল যে, যে অর্থ যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তিনি তাহাতেই তাহা ব্যয় করিতেন। নিজের পরদুঃখকাতরতা ও দানশীলতা সত্ত্বেও রাজ্যপালনের জন্য নিরূপিত অর্থ তিনি কখনও দানের জন্য গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ সুশৃঙ্খলার জন্যই তাঁহার শাসনকাল প্রত্যেক বিষয়ে কল্যাণ-পূর্ণ হইয়াছিল।

* কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ও নগদ ১৬ কোটি টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার নিজের রাজ্যের উন্নতির জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার দয়া ও বদান্যতা কেবলই হোল্‌কর রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। স্বদেশী হউক, অথবা বিদেশী হউক, আর্ত্ত ও নিরাশ্রয়ের জন্য তাঁহার সদাব্রতদ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া উত্তরভারত হইতে বহুসংখ্যক লোক, যখন, নানাস্থানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল, তখন, অহল্যা মুক্তহস্তে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে সকল স্থান হিন্দুধর্ম্ম মতে পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাদিগের অনেক স্থলেই তাঁহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। গয়ার ও বারাণসীর মন্দিরদ্বয় তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইয়াছিল। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমনাগমনের জন্য তিনি যে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, জীর্ণ ও অসংস্কৃত অবস্থায়, এখনও, তাহা সহস্র, সহস্র পথিকের ক্লেশ নিবারণ করিতেছে। *

* কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট নামক জনৈক সৈনিক-কর্ম্মচারী, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, হিমালয়স্থিত কেদারনাথ তীর্থে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, অহল্যার নাম তখনও সেখানে সমাদৃত ও জাগ্রত ছিল। প্রায় তিন হাজার ফুট উর্দ্ধে, যেখানে অপর মনুষ্যাবাসমাত্র নাই, সেখানে অহল্যা, তীর্থযাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য, ধর্ম্মশালা ও

আমরা বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক প্রধান তীর্থক্ষেত্রে অহল্যার কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই সকল প্রধান তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ শত শত তীর্থেও তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। দাক্ষিণাত্যের অনেকগুলি তীর্থের দেবমূর্ত্তি ও মন্দির, প্রতিদিন, তাঁহার প্রদত্ত গঙ্গাজলে স্নাত ও ধৌত হইত। বহুশত ক্রোশ দূর হইতে প্রতিদিন এইরূপ গঙ্গাজল আনয়ন করিতে তাঁহার যে বহু অর্থ ব্যয় হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শত শত ভারবাহী, এই কার্য্যের জন্ত, নিয়মিত রূপ নিযুক্ত ছিল। স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ ও আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি এরূপ বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে কুণ্ঠিত হইতেন না। উপাস্য দেবতাকে সেবা ও ভক্তি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তিনি প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধন করিবেন, এই বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত। এক দিকে, যেমন, তিনি দেশপ্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী অনুষ্ঠান করিতেন, অপরদিকে, তেমনি, সার্ব্বজনীন ভাবে ভূচর, খেচর সকল প্রকার প্রাণিগণেরও সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি প্রতিদিন সাধারণ দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইতেন, বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনে চণ্ডালাদি নীচ জাতীয় ব্যক্তিদিগকে প্রচুর আহারসামগ্রী বিতরণ করিতেন; শীতকালে দারিদ্র্য-

পীড়িত বৃদ্ধদিগকে শীতবস্ত্র দিতেন এবং গ্রীষ্মের কয়মাস তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল-দান করিবার জন্য, রাজপথের স্থানে স্থানে, সুশীতল জলকুম্ভ সহ লোক দণ্ডায়মান রাখিতেন। মহেশ্বরক্ষেত্রনিবাসী কৃষকগণ অনেক দিন দেখিতে পাইত যে, তাহাদের পরিশ্রান্ত মহিষ ও বৃষকে জলপান করাইবার জন্য, রাজভৃত্যগণ জলপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি নিজের একটী ক্ষেত্র পক্ষীদিগের আহার্য্য শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। নানা স্থান হইতে বিতাড়িত পক্ষিসমূহ তথায় আসিয়া আশ্রয় ও আহার লাভ করিত। মৎস্যদিগের জন্যও নর্ম্মদার জলে শক্তু ও গোধূম-মণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত। তীর্থক্ষেত্রে গমনের সময় তিনি নানাবিধ বৃক্ষের বীজ সঙ্গে লইয়া যাইতেন, এবং তরুহীন প্রান্তরে ও রাজপথের পার্শ্বে তাহা রোপণ করিয়া আসিতেন। রৌদ্রতপ্ত পথিক তাহাদিগের ছায়ায় বিশ্রাম করিবে, ক্ষুধাতুরগণ তাহাদিগের ফলে তৃপ্তিলাভ করিবে, এবং বিহগগণ তাহাদিগের শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ সার্ব্বজনীন দয়া পৃথিবীর অতি অল্প নয়, নারীর প্রকৃতিতেই লক্ষিত হয়। যে দেশে ও যে সমাজে এরূপ দয়াময়ী রমণী জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ধন্য। ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নহে;

অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীর জীবনই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

অহল্যা যে সময় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে সময়, তথায়, তাঁহাব অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধিমান্ নৃপতিব অভাব ছিল না। পেশওয়ে, নিজাম, মহীশূর-পতি, অযোধ্যার নবাব, এবং সিন্ধে প্রভৃতি তাঁহার সমকক্ষ ও তাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ আরও অনেক নরপতি, সে সময়, ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু সৎকার্য্যে ও লোকসেবায় তাঁহারা, তাঁহাব সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, বোধ হয়, তাঁহার সঙ্গে একত্র নামোল্লেখেরও যোগ্য ছিলেন না। ভগবৎ-প্রেরিত বৃষ্টি-ধারার ন্যায় অহল্যার করুণা, সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বস্থানে নিপতিত হইয়া, জগৎ সুশীতল করিত। তিনি যে পুণ্যকার্য্যে এত অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা কোথা হইতে আসিত, সে সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। সংক্ষেপে সে কথার উত্তর এই যে, তাঁহার আয় অন্যান্য রাজন্যবর্গের আয় অপেক্ষা অধিক না হইলেও, তাঁহার ব্যয় তাঁহাদিগের ব্যয় অপেক্ষা অনেক ন্যূন ছিল। সাধারণ নৃপতিগণ, আপনাদিগের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যয় করিয়া, নিঃস্ব হইয়া পড়েন; সুতরাং প্রজাগণের হিতার্থ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না। কিন্তু

অহল্যার, নিজের জন্য, কিছুই ব্যয় ছিল না; ব্রাহ্মণের ন্যায় মুষ্টিমেয় আতপ তণ্ডুলে যাঁহার পরিতৃপ্তি, তাঁহার পুণ্য-কার্য্যে অর্থ-ব্যয়ের প্রতিবন্ধক কি? রাজপদের সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য যে সকল বাহাড়ম্বর আবশ্যক, তুকোজীর তাহা ছিল; কিন্তু অহল্যা নিজে তপশ্চারিণীর ন্যায় থাকিতেন; সেই জন্যই তাঁহার কখনও সৎকার্য্যে অর্থাভাব হইত না। আরও একটা কারণ ছিল। অধিকাংশ রাজার সর্ব্বস্বই সৈনিক পরিপোষণে ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু অহল্যার সৈনিক-ব্যয় অতি পরিমিত ছিল। অল্প সংখ্যক সৈন্যের দ্বারাই তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি বর্ত্তমান রাখিতে ও বহিঃশত্রু হইতে দেশ-রক্ষা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। সৈনিক-সেবায় অর্থ ব্যয় না করিয়া সৎকার্য্যে ব্যয় করাতে একটা অতর্কিত শুভফলও উৎপন্ন হইয়াছিল। অধিক সংখ্যক সৈন্য রাখিলে, পাছে, সেই সৈন্য-বল তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, এই আশঙ্কায় প্রতিবাসিগণের মনে সর্ব্বদা অবিশ্বাস ও সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অহল্যার সৈনিক সংখ্যার ন্যূনতা হইতে তিনি যে কাহারও সহিত বিবাদ-প্রার্থিনী নহেন, সকলের মনে ইহাই বিশ্বাস ছিল। তিনি তেজোহীনা ও আত্মরক্ষণে অসমর্থা, তাঁহার ব্যবহার হইতে ইহা কেহ কখন চিন্তা করিতে

পারিতেন না; সুতরাং সাধ্যানুসারে কেহই তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেন না। এই জন্যই অহল্যার রাজ্য তাদৃশ সুদীর্ঘকাল শান্তি-সুখ ভোগ করিয়াছিল। অবিরত যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিলে এরূপ শান্তি কখনই ঘটিত না। কেবল সাংসারিক লাভালাভ লইয়া বিচার করিলেও অহল্যা, তাঁহার রাজ্যে শান্তিরক্ষার জন্য, যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার একজন উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—"রাজ্ঞী অহল্যার রাজত্বের শেষাংশে আমি পুনায় কোন সম্ভ্রমজনক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্র লোকের হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তিভাবের উদয় হইত। তাঁহার প্রতিবাসী নৃপতিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা দূরে থাকুক, অন্যের আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা না করা প্রত্যবায়জনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কেবল তাঁহার স্বজাতীয়গণ নহেন, হিন্দু, মুসলমান, সকলেরই, অহল্যার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। হায়দ্রাবাদের মুসলমান-নৃপতি নিজাম, মহীশুরের দুর্দ্দান্ত, হিন্দু-ধর্ম্ম-দ্বেষী টিপু সুলতান এবং পুনার ব্রাহ্মণ-নৃপতি পেশোয়া, সকলেই,

মভাবে, ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেন।”

অহল্যা কিরূপে আপনার রাজশক্তি পরিচালনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই বার তাঁহার পারিবারিক ঘটনার ও জীবনের শেষাংশের ইতিহাস বর্ণনা করিব।

কোন একটী ধর্ম্মসঙ্গীতে ভগবানের সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে,

“যে করে আমার আশ,
করি তার সর্ব্বনাশ।”

করুণাময় ভগবান, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, কাহারও সর্ব্বনাশ করেন, তাঁহার প্রতি এ দোষ আরোপ করিতে পারি না। তবে এ কথা মনে হয় যে, যাঁহারা ভগবানের কৃপা কামনা করেন, তাঁহারা যেন সাংসারিক সুখের অধিক প্রয়াসী না হন; বরং, সময়ে সময়ে, আপনাদিগের সর্ব্বনাশ দেখিতে প্রস্তুত থাকেন। বিধি লীলার মর্ম্মোদ্ভেদ করিবার মানবের শক্তি নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে কেহ সাংসারিক সুখে সুখী ছিলেন, ইহা বড় স্মরণ হয় না; বরং দেখিতে পাই, সংসারের রোগ-শোকময় অনলকুণ্ডে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া, ভগবান তাঁহাদিগের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল দেশেরই

ভগদ্ভক্তদিগের জীবন এ কথার সাক্ষ্য দান করিতেছে। করুণার প্রতিমূর্ত্তি অহল্যারও জীবন আলোচনা করিলে ভগবান তাঁহার দাসদাসীদিগকে কিরূপ কঠোর পরীক্ষা করেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আমরা অহল্যার প্রথম জীবনের মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; শেষ জীবনেও বিধাতা তাঁহার জন্য যে কঠোর দুঃখ রাখিয়াছিলেন, এইবার তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তৃতীয় অধ্যায়।

অহল্যার একমাত্র পুত্র মালেরাও কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মালেরাওয়ের মৃত্যুর পর অহল্যার দুহিতা মুক্তাবাই মাতার সাংসারিক শান্তির ও সান্ত্বনার স্থল হইয়াছিলেন। মুক্তাবাই বিবাহের পর স্বামিগৃহে বাস করিতেন; কিন্তু অহল্যা, নিজের অপর পুত্র, কন্যার অভাবে, মুক্তার একটী পুত্রকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া, পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালন করিতেন। এই বালকটীকে নিকটে রাখিয়া, অহল্যা, কিয়ৎপরিমাণে, পুত্রের অভাব বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার এমনই বিড়ম্বনা যে, মুক্তার পুত্র, যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিলেন এবং সে ঘটনার পর, সম্বৎসর অতীত হইতে না হইতে, পুত্রশোকাতুরা মুক্তা নিজেও বিধবা হইলেন। পুত্রবিয়োগের পর জামাতার ও দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিয়া অহল্যা, কিয়ৎপরিমাণে, শান্তি-লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে উপর্য্যুপরি এইরূপ বিপৎপাতে তাঁহার কোমল

হৃদয় একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু এই স্থলেই তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হইল না; [illegible]রায়ণা মুক্তা স্বামীর অনুগমন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। অহল্যা কন্যাকে সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; তাঁহার সম্মুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, সেই বৃদ্ধাবস্থায়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া না যাইবার জন্য, বারম্বার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু পতি-পুত্র-শোক-কাতরা মুক্তা কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষায় সম্মতা হইলেন না। তিনি অতি সস্নেহে, অথচ দৃঢ়তার সহিত, বলিলেন, "মা! তুমি আর কতদিন বাঁচিবে? দুই চারি বৎসরের মধ্যেই তোমার এই পবিত্র জীবন শেষ হইবে। কিন্তু আমাকে আরও বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। স্বামী ও পুত্র বিরহিতা হইয়া, তোমাব মৃত্যুর পর, আমার কি অবস্থা ঘটিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। জীবন তখন আমার পক্ষে ভারবহ হইবে। আজ আমি, সসম্মানে, স্বামীর চিতারোহণ করিয়া, যে শান্তি পাইবার আশা করিতেছি, তখন আমার সে সুযোগ থাকিবে না। মা! তুমি আমায় নিবারণ করিওনা।" অহল্যা যখন দেখিলেন যে, মুক্তা কিছুতেই নিবৃত্তা হইবার নহেন, তখন তিনি অগত্যা তাঁহার সঙ্কল্পে সম্মতি দান করিলেন এবং

স্বচক্ষে তাঁহার চিতারোহণ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, সহমরণের অনুযাত্রিগণের সঙ্গে, অহল্যা শ্মশান-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পবিত্র-সলিলা নর্ম্মদার কূল আলোকিত করিয়া চিতা প্রজ্বলিত হইল। অহল্যার তাৎকালিক মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহার হৃদয় ভূচর, খেচর এবং জলচর প্রাণিমাত্রেরই ক্লেশে ব্যথিত হইত, আজ তিনি নিজের প্রাণের পুত্তলিকে চিতায় সমর্পণ করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার মানসিক ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা কি সম্ভবপর? ধর্ম্মবিশ্বাসে ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় মনুষ্যের হৃদয় যতদূর সবল থাকিবার সম্ভাবনা, অহল্যার হৃদয় ততদূর সবল ছিল। কিন্তু মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের নিকট জ্ঞান, যুক্তি এবং ধর্ম্মবিশ্বাস সমস্তই পরাভূত হইল। প্রথম হইতেই অহল্যার হৃদয় যদিও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল, তথাপি তিনি কিয়ৎকাল, ধীরভাবে, চিতার অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু যখন অগ্নিশিখা মুক্তার সুকুমার দেহ স্পর্শ করিল এবং মুক্তার কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মুক্তার আর্ত্তনাদ নিমগ্ন করিবার জন্য, অনুযাত্রিগণ, প্রজ্বলিত চিতা পরিবেষ্টন

করিয়া, চীৎকার করিতেছিল, এবং বাদ্যোদ্যমে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিতেছিল। সন্তানবৎসলা অহল্যা সে অবস্থায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উন্মত্তার ন্যায়, সেই জনস্রোত ভেদ করিয়া, কন্যার চিতায় ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্যতা হইলেন। তাঁহার দুই জন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাঁহার দুইটী হস্ত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি চিতায় ঝাঁপ দিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি নিজে নিজের হস্ত দংশন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মুক্তার ও তাঁহার স্বামীর দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অহল্যা, নর্ম্মদার জলে তাঁহাদিগের প্রেতকৃত্য সমাপন করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয় এরূপ ব্যথিত হইয়াছিল যে, তিন দিন পর্য্যন্ত, তিনি কোনরূপ আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া আসিল। তিনি জামাতার ও দুহিতার উদ্দেশে একটী অতি সুন্দর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কথঞ্চিৎ শোক-সম্বরণ করিলেন।

সার জন ম্যালকম লিখিয়াছেন, "মাতৃস্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ সেই স্মৃতিমন্দির অপেক্ষা সুন্দর মন্দির ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছে।" তিনি আরও লিখিয়াছেন "আমি অহল্যা

তৃতীয় অধ্যায়।

এইরূপে অহল্যার রাজত্বকালের ত্রিংশৎবর্ষ পূর্ণ হইল। তাঁহার শাসনকালে সাধারণ ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অধিক সংঘটিত হয় নাই। শান্তভাবে ও নিরাড়ম্বরে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; সুতরাং ঐতিহাসিকগণ, যুদ্ধ, বিগ্রহাদি উত্তেজক ঘটনার অভাবে, তাহাতে বর্ণনযোগ্য উপাদান অধিক প্রাপ্ত হন না। ভগবানের ইচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-সম্পাদন, এবং জীবের প্রতি করুণা ও আশ্রিতজনের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন ইত্যাদিরই পৌনঃপুনিকতায় তিনি জীবন শেষ করিয়াছিলেন। মিতাচারে অভ্যস্তা হওয়াতে হিন্দু-বিধবাগণ সাধারণতঃ দীর্ঘজীবিনী হইয়া থাকেন। কিন্তু অহল্যায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। রাজকার্য্য-সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে কঠোর শ্রম করিতে হইত, অথচ শরীর রক্ষার প্রতি তাঁহার একবারেই দৃষ্টি ছিল না। শরীর অসুস্থ হইলেও তিনি নিয়মিত ব্রত ও উপবাস হইতে বিরতা থাকিতেন না। সুতরাং শারীরিক নিয়ম-

---

একজন সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার কন্যার চিতাভূমিতে গমন করিয়াছিলাম; যেখানে মুক্তার চিতা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং যেখানে দণ্ডায়মান হইয়া, অহল্যা সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন, উক্ত কর্ম্মচারী তাহা আমাকে দেখাইয়াছিলেন।"

লঙ্ঘনের ফলে মৃত্যু অপেক্ষাকৃত সত্বর পদেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেন বলিয়া, তিনি, অসুস্থ শরীরেও, অন্তঃপুর হইতে রাজসভায় আসিয়া বসিতেন; কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার শরীর এরূপ দুর্ব্বল হইয়া আসিল যে, তিনি উত্থান-শক্তি-রহিতা হইলেন। নিজের আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া, তিনি পারত্রিক মঙ্গল-লাভে আরও অধিক যত্নবতী হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি "মুক্তদ্বার-অন্নসত্র" সংস্থাপন করিয়াছিলেন; এক্ষণে প্রতি দিন এক সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজনের ও অন্ধ, আতুর প্রভৃতিকে বস্ত্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। মৃত্যুব দিন দ্বাদশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের আদেশ দিলেন। এইরূপে সমস্ত জীবন পর-সেবায় উৎসৃষ্ট রাখিয়া এবং মাতৃস্নেহে প্রজাপুঞ্জকে প্রতি-পালন করিয়া, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ-কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে, ষাট বৎসর বয়সের সময়, অহল্যা পরলোক গমন করিলেন। যে জ্যোতির্ম্ময় দীপ এতদিন হোল্-কর-গৃহ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাণ হইল; যে দেবী-প্রতিমা ইন্দোর-নগরী পবিত্র করিয়াছিল, তাহা ভগ্ন হইল। হিন্দু-বিধবার জীবনের প্রতি মমতা কোন কালেই থাকে না; তাহার উপর স্বামী, পুত্র, কন্যা, জামাতা এবং দৌহিত্রের শোকে অহল্যার

শরীর ও মন উভয়ই জর্জ্জরিত হইয়াছিল। সুতরাং মৃত্যু তাঁহার নিকট অতি শান্তিময় বলিয়াই বিবেচিত হইল। অহল্যার নশ্বর, ধূলিময় দেহ পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বদেশীয় লক্ষ লক্ষ নর, নারীর প্রাণে ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা বর্দ্ধন করিতেছে।

অহল্যার প্রকৃতির ও অনুষ্ঠিত কার্য্যের দোষ, গুণ আলোচনার পূর্ব্বে, তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। তিনি শ্যামাঙ্গী ও কৃশকায়া ছিলেন। লোকে যাহাকে সৌন্দর্য্য বলে, তাহা তাঁহার ছিল না, বলিলেও হয়। রাঘোবার রূপবতী কিন্তু দুঃশীলা পত্নী, আনন্দীবাই, অহল্যার দেশব্যাপী প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ঈর্ষাপরায়ণা ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই মানসিক সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা শারীরিক সৌন্দর্য্যেরই প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে। অহল্যা দেখিতে কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য আনন্দীবাই, একবার, আপনার একজন পরিচারিকাকে অহল্যার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পরিচারিকা ফিরিয়া যাইয়া আনন্দীকে বলিয়াছিল যে, "অহল্যা দেখিতে সুন্দরী নহেন, কিন্তু কি যেন একটী স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাঁহার মুখে সর্ব্বদা

বিরাজিত রহিয়াছে।” সৌন্দর্য্য-গরবিনী আনন্দীবাই এই সংবাদে পরিতৃপ্তা হইলেন, এবং পরিচারিকাকে বলিলেন, “সে ত সুন্দরী নয়, তাহা হইলেই হইল।” হায়! সংসারের অনেক রমণীই, রূপ, যৌবনের অভি-মানে, এইরূপ আত্ম-বঞ্চিতা হইয়া, পরিতৃপ্তা থাকেন।

অহল্যার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, আমরা পূর্ব্বেই তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি। তাঁহার প্রকৃতিতে নারী-জনোচিত কোমলতার সহিত রাজকার্য্যোপযোগী কঠোরতার যেরূপ সম্মিলন হইয়াছিল, পৃথিবীর অতি অল্প রমণীরই প্রকৃতিতে সেরূপ লক্ষিত হয়। তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতেন এবং অতি অল্প সময়েই লোকে তাঁহার ক্রোধ দেখিতে পাইত। কিন্তু যখন তিনি সত্যই কাহারও প্রতি বিরক্ত হইতেন, তখন তাঁহার অতি বিষম [illegible] কেহ তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে

পেশওয়ে মাধবরাও তাঁহাকে আপনার কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তুকোজী-রাও, পেশওয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, শিবাজী গোপালকে শ্রীমন্তের সেবকত্ব স্বীকার করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। শিবাজী গোপালও আহ্লাদের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেহই অহল্যাবাইয়ের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে তুকোজীরাও ও নারো-গণেশ ইন্দোরে প্রত্যাগমন করিলে, অহল্যা তাঁহাদিগের মুখে শিবাজীগোপালের নিয়োগের সংবাদ অবগত হই-লেন। প্রভুর বিনানুমতিতে, তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করিয়া [illegible] প্রভুর অধীনে কার্য্যগ্রহণ যে সেবকের পক্ষে [illegible], তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অহল্যা তুকোজীর [illegible] সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিলেন; "তোমাদের ব্যবহারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই রাজ্য [illegible] সরকারের সহিত আমার কোনও সম্পর্ক [illegible] শিবাজীগোপালের নিয়োগে আমার [illegible] বিবেচনা করি[illegible] আমাদের প্রতি একটা [illegible] [illegible] এক[illegible]

নের কয়দিন স্নান, সন্ধ্যায় অতিবাহিত করিয়া জন্ম-সার্থক করিব। রাজ্যের সমস্তভার অগ্রেই তোমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এখন, যাহাতে, স্বর্গীয় সুভেদারের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া, শ্রীমন্তের অনুগ্রহভাজন হইতে পার, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। অধিক আর কি বলিব? আমার সংবাদ কতদূর লইবে বা আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার লক্ষণ ত এখনই দেখিতে পাইতেছি।"

অহল্যাবাইয়ের এই অভিমানপূর্ণ, নিষ্ঠুর বাণী শ্রবণ করিয়া তুকোজী, স্বীয় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে, নিজেই নিজের গণ্ডে চপেটাঘাত পূর্ব্বক, অহল্যার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন;—"কৈলাসবাসী সুভেদার জীবিত থাকিতে, জ্ঞাতি-বিরোধাদি বিস্মৃত হইয়া আজীবন, ক্রীতদাসের ন্যায়, তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছি। সুভেদার প্রত্যেক বিষয়ে আপনার উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। আমার প্রতি সুভেদারের অনুগ্রহ দেখিয়া আপনি আমাকে মানুষ করিয়াছেন। এই কারণে, আপনিই আমার সুভেদার ও প্রত্যক্ষ "মাতুশ্রী" (জননী)। প্রাণ যাউক্ অথবা থাকুক, স্বয়ং মার্ত্তণ্ড (তুকোজীর কুলদেবতা) আসিলেও, আর আপনার সহিত প্রতারণা করিব না, অথবা আপনার চরণ হইতে

ভল মাত্র বিচ্যুত হইব না। এবার, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আমার প্রতি সদয় উন।”

তুকোজীকে প্রকৃত অনুতপ্ত জানিয়া অহল্যাবাই লিলেন,—“মুখে বলায় কোনও ফল নাই; কার্য্যে যাহা দখিব, তাহাই সত্য বলিয়া জানিব। কথা মত কার্য্য রিলে, ঈশ্বর কখনও উপেক্ষা করেন না।” কথিত আছে, এই ঘটনার পর হইতে তুকোজী আর কখনও অহল্যা-বাইয়ের সম্মতি না লইয়া কোনও কার্য্য করেন নাই।

গঙ্গাধর যশোবন্তের ও রাঘোবার চক্রান্ত-ভেদ করিতে অহল্যা কিরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য ঘটনায়ও তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, উদ্যম এবং নির্ভীকতা, পুনঃ পুনঃ, প্রকাশিত হইয়াছিল। মাহাধাজী সিন্দের সেনাপতি জীউবা-দাদা-বক্সীর সহিত তুকোজীর কোনও কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। এই কারণে, তুকোজীরাও জয়পুরের রাজার নিকট আপনাদিগের প্রাপ্য কর আদায় করিবার জন্য গমন করিলে, জীউবাদাদা গোপনে জয়-পুরপতিকে তুকোজীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জয়পুরের রাজার নিকট হোল্‌কররাজ্যের প্রায় চার লক্ষ টাকা কর বাকী ছিল। তুকোজীরাও,

সেই টাকা আদায়ের জন্য, পীড়াপীড়ি করিলে জয়পুরপতির দেওয়ান দৌলতরাম তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন। "আমাদিগের দেয় কর প্রদান করিতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা সিন্দের ও আপনাদিগের, উভয়েরই, নিকট করদানের জন্য বাধ্য আছি। আপনাদিগের মধ্যে যিনি অধিক ক্ষমতাশালী হইবেন, তিনিই আমাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবেন।" এই উত্তরে তুকোজীরাও, জয়পুরপতির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, যুদ্ধ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই জীউবাদাদা তাঁহাকে আক্রমণ করায় তুকোজীকে পরাজিত হইতে হইল। এই যুদ্ধে তুকোজীর কয়েকজন সেনাপতি ও বহুসংখ্যক সাহসী যোদ্ধা নিহত হওয়াতে, তিনি, পলায়ন করিয়া, জয়পুরের ২২ ক্রোশ দূরস্থিত ব্রাহ্মণগাঁও নামক স্থানের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

অহল্যাবাই, এই সময়ে, মহেশ্বর-ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। তুকোজীরাও, তাঁহাকে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়া, তাঁহার নিকট সৈন্য ও অর্থ চাহিয়া পাঠাইলেন। অহল্যাবাই তুকোজীর পরাজয় ও পলায়ন-সংবাদ শ্রবণে অতি মাত্র ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন;—"তুকোজী যুদ্ধে নিহত হইলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না;

"কিন্তু যাহারা এত দিন, ভৃত্যের ন্যায়, আমাদিগের অনুগত ছিল, এই বৃদ্ধ বয়সে তাহাদিগের হস্তে এরূপ অপমান কখনই সহ্য হয় না।"* এই বলিয়া তিনি তুকোজীব সাহায্যের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে, আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক, নিম্নলিখিত রূপ এক পত্র লিখিলেন; "হতাশ বা ভীত হইওনা। সাহস পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নকে যথোপযুক্ত দণ্ড দিবে। চিন্তা করিও না; আমি তোমার সাহায্যের জন্য সৈন্যের ও অর্থের সেতু বাঁধিয়া দিতেছি। বার্দ্ধক্য বশতঃ যদি তোমার যুদ্ধে সামর্থ্য বা উৎসাহ না থাকে, তাহা হইলে আমাকে পত্র লিখিবে; আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইব।"

তুকোজীকে এইরূপ পত্র প্রেরণ করিয়া, অহল্যাবাই, "শিলেদার" (অশ্বারোহী সৈনিক) সংগ্রহ করিবার জন্য, ১০।১২ জন কারকুনকে খান্দেশ ও অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন। অল্প কালের মধ্যেই অষ্টাদশ সহস্র শিলেদার সংগৃহীত হইয়া তুকোজীর সাহায্যের জন্য প্রেরিত হইল।

অহল্যাবাইয়ের নিকট এইরূপ সাহস ও উৎসাহপূর্ণ লিপি এবং প্রয়োজনানুরূপ সৈন্য ও অর্থ-

---

* এই সময় অহল্যার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া তুকোজীরাও জীউবাদাদাকে আক্রমণ করিলেন। প্রায় তিন মাস যুদ্ধের পর জীউবা, পরাজিত হইয়া, স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক, ক্ষমা প্রার্থনা করিলে যুদ্ধেব অবসান হইল।*

একদিকে অনুগতজনের প্রতিপালনে মাতৃস্নেহ এবং অপর দিকে অত্যাচারীর দমনে রুদ্রভাব, এই উভয়গুণ অহল্যার প্রকৃতিতে সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। আশ্রয়-প্রার্থিনী বিধবার পুত্রকে ক্রোড়ে লইবার সময় তিনি আপনার রাজ্ঞীত্ব বিস্মৃত হইতেন, আবার অনৃতা-চারীকে দণ্ড দিবার সময়ে নিজের রমণীসুলভ কো[illegible] তাও বিসর্জ্জন করিতেন। গঙ্গাধর যশো[illegible] রাঘোবার চক্রান্ত ভেদে এবং ভীল দস্যু[illegible]

* এ সম্বন্ধে স্যার জন ম্যাল[illegible] —It was more of a quarrel between Tukaj[illegible] [illegible]d Mahadjee's commander, than between the Sindhia and Holkar families. P. 142.

অহল্যার চতুরতা সম্বন্ধেও একটী আখ্যায়িকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত হইলেও ইহার মূলে সম্ভবতঃ কিছু সত্য আছে। "সুভেদার মহ্লাররাওয়ের মৃত্যুকালে তাঁহার ধনাগারে প্রায় ১৬ কোটী টাকা সঞ্চিত ছিল। রাঘোবা দাদা, এই সংবাদ অবগত হইয়া, একবার মালবের নিকটবর্ত্তী কোনও প্রদেশে অবস্থান কালে,

তাঁহার প্রকৃতির এই কঠোর ভাব সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ অতি তীক্ষ্ণ ছিল। নিজের চেষ্টায় ও যত্নে তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সুন্দর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সুভেদারের দুহিতা হর্‌কুবাই ও উদাবাই নাম্নী তাঁহার ননন্দাদিগকে তিনি নিজেই লেখা পড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, এবং পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ তিনি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় অতি জটিল বিষয় সমূহও স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন।

রাজস্ব-সংগ্রহ এবং শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে অহল্যাবাই যে সকল সুনিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

উহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার জন্য অহল্যাবাইকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, "সৈন্য-ব্যয়ের জন্য আমাদের আপাততঃ অত্যন্ত অর্থের অভাব ঘটিয়াছে। আপনি এ সময় আমাদিগকে কিছু অর্থ সাহায্য করুন।" অহল্যাবাই রাঘোবার প্রকৃতি জানিতেন। তিনি, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমি সমস্ত অর্থ দানধর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্য রাখিয়াছি। আপনার যদি আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে আমি সঞ্চিত অর্থের উপর যথাবিধি তুলসী-পত্র-স্থাপন, গঙ্গাজল-

তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীর ও বিধিসমূহের উপর সাধারণের এরূপ শ্রদ্ধা ছিল যে, রাজ্য সম্বন্ধে কখনও কোন নূতন বিষয় প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, তাহা অহল্যার প্রবর্ত্তিত নিয়মের বিরোধী কিনা, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা হইত। রামচন্দ্রের রাজত্বকালের ন্যায় তাঁহারও রাজত্বকাল যেন আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী ভূপালগণের মধ্যে কেহ প্রজারঞ্জন করিতে চাহিলে তিনি অহল্যার প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করিতেন। কোন অভিনব রাজবিধি প্রবর্ত্তনের সময়ে প্রবর্ত্তক যদি দেখাইতে পারিতেন যে, তাহা অহল্যার মতের অনুমোদিত, তাহা হইলে লোকে ভাবিত যে তাহা ধর্ম্মসঙ্গত বটে, এবং তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না।

সেচন ও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া, তাহা আপনাকে দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি অনায়াসে তাহা গ্রহণ করিতে ও যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারেন।" গর্ব্বিতস্বভাব রাঘোবা, প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের ন্যায়, এরূপভাবে দান গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া, অভিমানে তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ইহার উত্তরে অহল্যাবাই বলিলেন—"যুদ্ধে প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি দান, ধর্ম্মের জন্য সংকল্পিত অর্থ অন্য কার্য্যে ব্যয় করিব না।" এইরূপ প্রত্যাখ্যানের পরদিন রাঘোবা

তৃতীয় অধ্যায়।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময়ে অহল্যার পতিবিয়োগ হয় ; সুতরাং সাংসারিক সুখ তাঁহার জীবনে অতি অল্পই ঘটিয়াছিল। ইহার উপর পুত্র, দুহিতা, জামাতা এবং দৌহিত্র ইত্যাদির মৃত্যুতে তিনি একেবারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। কোনরূপ সাংসারিক সুখভোগ যে তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না, ইহা তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন। তাদৃশ অবস্থায় সংসারের প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। অন্য অনেক নরপতি, এরূপ অবস্থায়, মন্ত্রিগণের উপর রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া, শান্তি অন্বেষণ করিয়াছেন। কিন্তু অহল্যার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এরূপ কঠোর এবং প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার অনুরাগ এরূপ অকপট ছিল যে, তিনি কিছুতেই সেরূপ বৈরাগ্য-অবলম্বন উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার স্বদেশীয় কবি [illegible], তাঁহার একটী অভঙ্গে,

---

যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইলে, অহল্যাবাই, বীরবেশে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক, অস্ত্র, শস্ত্রে সুসজ্জিতা পাঁচ শত দাসীর সহিত রাঘোবার সম্মুখীন হইলেন। অহল্যাবাই জানিতেন যে, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ রমণীর সহিত কখনও যুদ্ধ করিবেন না ; সুতরাং বিনা যুদ্ধে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এই জন্য, তিনি সৈন্য, সামন্তের পরিবর্ত্তে কেবল আপনার দাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া, সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, ফলেও

(কবিতায়) এইরূপ বলিয়াছেন যে, "যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন করিবে!" অহল্যার জীবনে তুকারামের এই উপদেশ সম্যক্‌রূপেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। বাস্তবিকই তিনি, কর্ত্তব্য-পালনের জন্য, বিপদকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না, অথচ তিনি এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজ্যসংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেন যে, ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও সেরূপ পারেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার সময় হোল্‌কর রাজ্য যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। তাঁহার প্রজাগণ এখনও যে তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্র্ কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়, এবং লোকে, এখনও, যে তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার যথেষ্টই কারণ আছে।

তাহাই ঘটিয়াছিল। রাঘোবা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আজ্ঞাদান করিলে, তাঁহার অধীন মারাঠা সর্দ্দারগণ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন রাঘোবা, নিরুপায় হইয়া, অহল্যাবাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "আপনার সৈন্য, সামন্ত কোথায়?" উত্তরে অহল্যাবাই বলিলেন ;—"আমরা পেশওয়েগণের সেবক। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, আমরা রাজদ্রোহী হইতে

তৃতীয় অধ্যায়।

অহল্যা ধর্ম্মানুরাগিনী ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মান্ধা ছিলেন না। হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণই তাঁহার রাজ্যে সমান শান্তিতে বাস করিতেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য তাঁহার রাজ্যে কাহাকেও অনুগ্রহ বা কাহাকেও নিগ্রহ করা হইত না। ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার ভক্তির সীমা ছিল না; ব্রাহ্মণগণই তাঁহার দানের অধিকাংশ ভোগ করিতেন বলিয়া কোন ঐতিহাসিক তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজন হইলে, সেই ব্রাহ্মণেরও দোষ প্রদর্শনে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন না। একবার অনন্ত-ফন্দী নামক এক ব্রাহ্মণ, তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া, উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি সুকবি ও সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু কোন মুসলমান ঐন্দ্রজালিকের সংসর্গে

ইচ্ছা করি না; তবে হোল্কর-বংশের ধর্ম্মার্থ উৎসৃষ্ট সম্পত্তি রক্ষা করাও আমার কর্ত্তব্য, সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আপনি আমাকে ও আমার এই দাসীগণকে নিহত করিয়া, আমার ধর্ম্মার্থ রক্ষিত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া বৈরসাধন করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

অহল্যার এই কৌশলপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া রাঘোবা নিরুত্তর হইলেন; এবং স্বীয় ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া, অহল্যা সন্তোষ-সাধন পূর্ব্বক, অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণোচিত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রজাল দেখাইয়া বেড়াইতেন। অহল্যা, তাঁহাকে তাঁহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া, তিনি যে ব্রাহ্মণের অযোগ্য ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাঁহাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, অহল্যার সস্নেহ অথচ কঠোর উপদেশে, অনন্ত-ফন্দীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।*

অহল্যার দেবভক্তির ও জীবানুরাগের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃতিতে আরও এমন একটী গুণ ছিল যে, পৃথিবীর অতি অল্প রাজায় ও রাজ্ঞীতে তাহা লক্ষিত হয়। যাঁহারা ধন ও প্রভুত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তোষামোদ তাঁহাদিগের নিকট অন্ন জলেরই ন্যায় নিত্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ অবস্থাতে চাটুবাদের অস্পৃশ্য থাকেন, তাঁহাদিগের প্রকৃতি দেবতুল্য সন্দেহ নাই। অহল্যার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই ছিল যে, তিনি তোষা-

* অনন্তফন্দী মহারাষ্ট্রদেশের "লাওনীকার" কবিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। অচিন্তিত-পূর্ব্ব কবিতারচনায় তাঁহার শক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার কবিতা শুনিবার জন্য ২০ ক্রোশ দূর হইতে লোক সমাগম হইত। ক্রোধ-সন্তপ্তা অহল্যা, তাঁহার কবিতা-শ্রবণে প্রসন্ন-চিত্ত হইয়া একবার, তাঁহাকে এক জোড়া সাল উপহার দিয়াছিলেন।

মোদের অস্পৃশ্যা ছিলেন। একবার কোন ব্রাহ্মণ, অহল্যার অনুগ্রহ-ভাজন হইবার প্রত্যাশায়, তাঁহার গৌরব-বাণী-পূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতদিগের অভ্যাসানুরূপ তিনি, তাহাতে অহল্যার অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিয়া, সেই গ্রন্থ অহল্যাকে শুনাইয়াছিলেন। অহল্যা যথাসাধ্য ধৈর্য্যের সহিত, গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন, এবং তাহার পর ব্রাহ্মণকে বিনীত বচনে বলিলেন; "আমি অতি পাপীয়সী রমণী,আপনার এইরূপ অতিরিক্ত প্রশংসাবাদের যোগ্য নই" এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইয়া, নর্ম্মদার জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন এবং তোষামোদকারী ব্রাহ্মণের আর কোন সংবাদই লইলেন না। প্রশংসার আকর্ষণ এমনই মধুর যে, প্রশংসাকারীর বাক্য অসঙ্গত বলিয়া বুঝিলেও, তাহার প্রতি আমাদিগের অনুকম্পা জন্মে, এবং তাহার অভিলাষ অপূর্ণ রাখিতে ক্লেশ বোধ হয়। কিন্তু অহল্যা এই ঘটনা উপলক্ষে যে মহত্ত্ব ও যে দৃঢ়-চিত্ততা দেখাইয়াছিলেন, পৃথিবীর অতি অল্প মনুষ্যই তাহা দেখাইতে পারেন। সার জন ম্যাল্‌কম যথার্থই বলিয়াছেন যে, "অহল্যার ন্যায় রাজ্ঞী পৃথিবীর ইতিহাসে অতীব বিরল।"

অহল্যার জীবনের ইতিহাস হইতে আমরা অনেক

সুন্দর উপদেশ লাভ করিতে পারি। মানসিক শক্তি যে কেবল পুরুষেরই একাধিকার নহে, ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্ট অনুমান করিতে পারা যায়। নারী হইয়াও তিনি, যেরূপ সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলার সহিত, আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যে কোন পুরুষেরই পক্ষে তাহা গৌরবজনক। উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে, রমণীও যে পুরুষ-সুলভ অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় দিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে রমণী এক্ষণে অশিক্ষিতা ও অনাদৃতা। স্বামী, পুত্রের কার্য্যে সহায়তা করিতে অক্ষমা ভাবিয়া পুরুষ তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিতা করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এদেশে রমণীর শক্তি ও সামর্থ্য, সাগর-গর্ভস্থিত রত্নের ন্যায়, নিষ্প্রভ ও নিরর্থক হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা রমণীকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিতা করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে, নারী-প্রকৃতি পুরুষপ্রকৃতি হইতে বিভিন্ন; রমণীর পক্ষে কোমলতা এবং পুরুষের পক্ষে কাঠিন্য স্বাভাবিক; সুতরাং রমণীকে সংসারের কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম কোমলতা বিনষ্ট হইয়া, সংসারের অকল্যাণ সাধিত হইবে। এ কথা যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কোমলতার ও

কাঠিন্যেরও এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। পুরুষ প্রকৃতিতে যেমন কেবলই কাঠিন্য থাকিলে, তাহা রুদ্র-ভাবে পরিণত হয়, নারী প্রকৃতিতেও, তেমনই, কেবল মাত্র কোমলতা থাকিলে, তাহা সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের অনুপযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। বীণার প্রত্যেক তন্ত্রী হইতে একই মাত্র সুর সমুৎপন্ন হইলে, তাহা প্রীতিকর হয় না; নরনারীর হৃদয়েরও ভিন্ন. ভিন্ন বৃত্তি হইতে, কঠোরতাই হউক, বা কোমলতাই হউক, এক মাত্র ভাব উৎপন্ন হইলে তাহা আনন্দ ও তৃপ্তিদান করিতে পারে না। এইজন্য কঠিনের সহিত কোমলের এবং কোমলের [illegible] কঠিনের সম্মিলন, নর, নারী উভয়েরই প্রকৃতির [illegible] ক। এই সম্মিলনের অভাব ঘটিলে মানসিক বৃত্তি [illegible] স[illegible] পরিস্ফুরণ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশের অনেকেই এ কথা স্মরণ রাখেন না। সেই জন্য তাঁহারা নারী-প্রকৃতিতে কেবল মাত্র কোম-লতারই বিকাশ দেখিতে চান। সাহস, তেজস্বিতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি গুণ, পুরুষোচিত ভাবিয়া, তাঁহারা রমণীতে তাহাদিগের পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই আদর্শ অপেক্ষাকৃত আধুনিক; প্রাচীন ভারত-সমাজে এ আদর্শ ছিল না। প্রাচীন ভারতের যিনি গণেশ-জননীরূপে

মাতা এবং যিনি অন্নপূর্ণারূপে গৃহিণী, মাহষ-মর্দ্দিণীরূপে, তিনিই আবার সমরাঙ্গণ-বিহারিণী। সেই আদর্শ হইতেই মহাশক্তির হস্তে পাশাঙ্কুশ ও বরাভয় যুগপৎ বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত প্রভৃতি ভারতের বীরজাতিগণের আদর্শও বঙ্গবাসিগণের আদর্শ হইতে বিভিন্ন। বঙ্গসন্তান কেবলই কোমলতার পক্ষপাতী; কোমলতার প্রতি তাঁহার অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ বঙ্গরমণী, স্নেহ, দয়া, সহিষ্ণুতা, প্রেম প্রভৃতি গুণে পৃথিবীর অপর কোন দেশের রমণীর অপেক্ষা নিকৃষ্টা না হইলেও, সাধারণতঃ, তেজোহীনা ও আত্মরক্ষণে অসমর্থা। অহল্যার প্রকৃতিতে তেজস্বিতার সহিত কোমলতার তাদৃশ সামঞ্জস্য হইয়াছিল বলিয়াই আমরা তাঁহার এরূপ প্রশংসা করিয়াছি এবং সেইজন্যই তাঁহাকে নারী-সমাজের আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

আধুনিক শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে বিচার করিয়া অহল্যার দোষগুণ পর্য্যালোচনা করা সঙ্গত হইবে না। সে আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, বুদ্ধের, সক্রেটিশের, বা খ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষকেও কেহ, কেহ অজ্ঞ ও কুসংস্কারান্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। অহল্যা যে জ্ঞান ও যে ধর্ম্মালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন কি না, এবং আত্ম-

জীবন তদনুসারে ভগবানের ও ভগবানের সৃষ্ট জীবগণের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন কি না, তাহাই আমাদিগের বিবেচনার বিষয়। খ্রীষ্ট কেন চৈতন্যের ন্যায় কার্য্য করেন নাই, সীতা বা সাবিত্রী কেন কুমারী নাইটিঙ্গেলের ন্যায় পরোপকার-ব্রতে নিযুক্তা হন নাই, একথা বলাও যেমন সঙ্গত, দেবব্রাহ্মণ-সেবিকা অহল্যা আধুনিক কোন একেশ্বরবাদিনীর ন্যায় কার্য্য করেন নাই কেন, সে কথা বলাও তেমনই যুক্তিযুক্ত। বিধাতার দানের তিনি যে অপব্যবহার করেন নাই, আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে তিনি যে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রধান গুণ। তাঁহার স্রষ্টা তদনুসারেই তাঁহার কার্য্যের বিচার করিবেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা অনেক রাজ্ঞী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু একদিকে সতী-ধর্ম্ম, অপরদিকে ভগবদ্ভক্তি, নিঃস্বার্থতা, সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা, এবং বিনয় প্রভৃতি গুণে তাঁহার সমকক্ষা রাজ্ঞী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন, বিবেচনা হয়। রাজ্ঞী শব্দে হিন্দুর যাহা আদর্শ, তাহা যেন তাঁহাতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। রাজসংসারের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও তিনি সর্ব্বত্যাগিনী * এবং সর্ব্বজন-পূজ্যা

* ইন্দোরে "আর্সে মহল" নামক একটী গৃহ ছিল। ইহা

রাজ্ঞী হইয়াও তিনি সকলের সেবিকা ছিলেন। অষ্টাদশ-বর্ষ বয়সের সময় তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। সে বয়সে, সাধারণতঃ, ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু সংযম, সেবা, এবং আরাধনা দ্বারা অহল্যা নিজের হৃদয়ে এরূপ কঠোর বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়াছিলেন যে, তপস্বিনী-গণেরও পক্ষে তাহা প্রার্থনীয়। সংসারের প্রত্যেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি, অথচ কোন বস্তুতেই আসক্তি নাই, ইহাই হিন্দুর সংসার-ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। অহল্যার জীবনে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। রাজ্ঞীরূপে তিনি আপনার কর্ত্তব্য কিরূপ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহা আলোচিত হই-য়াছে। তিনি যদি দরিদ্রের গৃহিণী হইতেন, তাহা হইলেও যে তিনি, নিজের ব্যবহারে, তাঁহার স্বামী, পুত্রের জীবন আনন্দময় করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কোন অবস্থাতেই হউক, কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ইচ্ছুক ও সক্ষম ব্যক্তিই পূজার্হ। অহল্যা সুখে, দুঃখে, সকল অবস্থা-তেই, আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদিগের এরূপ শ্রদ্ধার পাত্রী। অহল্যার সমকাল-বর্ত্তিগণ তাঁহাকে জীবন্মুক্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

নানাবিধ বিলাস-দ্রব্যে এবং মনোহর উপকরণে সজ্জিত থাকিত। অহল্যা বৈধব্যের পর কখনও সে গৃহে প্রবেশ করেন নাই। তিনি যে কোন সুখাদ্য দ্রব্য আহার করিতেন না, সে কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

শূদ্রাণী হইয়াও তিনি, জীবদ্দশায়, ব্রাহ্মণগণের [illegible] হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বদেশীয়গণের [illegible] শ্রদ্ধা ছিল, নিম্নলিখিত একটী মহারাষ্ট্রীয় কবিতার অনুবাদ হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। কবিতাটী অহল্যার সম-কালবর্ত্তী, পুনার রাজকবি, ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত ময়ূরপন্তের বিরচিত ;—

"হে দেবি ! অহল্যে ! তুমি ধরণীর ভূষণ স্বরূপা ; বরেণ্যা ও হরিহরের প্রতি সমান ভক্তিমতী ; সূর্য্যসম তেজস্বী ব্যক্তিরা তোমার সৎকীর্ত্তি খ্যাপন করিয়া থাকেন ; তাঁহারা বাণ-কন্যা ঊষা অপেক্ষা তোমাকে সমধিক গুণ-শালিনী বলিয়া বর্ণনা করেন।

দেবি, অহল্যে ! তুমি ত্রিভুবনে ধন্যা হইয়াছ। কলি-কালে তোমার ন্যায় ধর্ম্মনিরতা কোনও রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জানা নাই।

যাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রুত হইয়াও তাহার আচরণ করে না, সেই সকল পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তির কে প্রশংসা করে ? (তাই বলিতেছিলাম) তোমার ন্যায় প্রকৃত ধর্ম্মনিরতা রমণীর কথা কলিযুগে শ্রুত হওয়া যায় না।

পার্ব্বতী অথবা সীতারূপে তুমি অবতীর্ণা হইয়াছ। রাজন্যবর্গের যোগ্য সৎকীর্ত্তি-জনিত খ্যাতি তুমি অল্পদিনের মধ্যেই লাভ করিয়াছ।

হে দেবি! তুমি নর্ম্মদাতীর পরিত্যাগ করিতেছ না, কারণ নর্ম্মদা তোমার প্রিয়সখী। নর্ম্মদা গঙ্গারও সখী। সেই সখিত্ব সূত্রেই কি তুমি এরূপ পূতহৃদয়া হইয়াছ?

গয়ার শ্রীবিষ্ণু-পদের অর্চ্চনার সহিত তোমারও প্রতি সম্মান-প্রকাশ ভক্তগণের কর্ত্তব্য। * সমগ্র বিশ্ব যাঁহার বন্দনা করে, কবি ময়ূর কেন না তাঁহার বন্দনা করিবে?"

তাঁহার কৌষেয়-বসন-পরিহিতা, ব্রতখিন্না, ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তিদেখিলে তাঁহার প্রজাগণের হৃদয় মাতৃভক্তিতে বিগলিত হইত। স্বভাবতঃ করুণাময়ী রমণী রাজ্ঞী হইলে তাঁহার দ্বারা প্রজাপুঞ্জের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এবং সর্ব্বত্যাগিনী হিন্দুবিধবা, আত্ম-সুখ নিরপেক্ষ হইয়া কিরূপে সর্ব্বভূতের মঙ্গল সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। সহস্র, সহস্র নরনারীর সুখ, দুঃখের গুরুভার তাঁহার হস্তে অর্পিত ছিল; কিন্তু তাঁহার গৌরবের বিষয় এই যে, আত্মসুখের জন্য, তিনি কখনও কাহাকেও অসুখী করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, ভারতীয় পৌরাণিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নহে, অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীই তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষ অনেক মনস্বিনী রমণীর জন্মভূমি; তাঁহাদিগের সকলের নামের সঙ্গে, গ্রথিত হইয়া, অহল্যারও নাম এদেশে চিরস্মরণীয় হইবে।

---

* গয়ার শ্রীমন্দিরে অহল্যার শ্বেত-প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, সত্যই তাহা ভক্তগণ কর্ত্তৃক দেবোচিত শ্রদ্ধায় অর্চ্চিত হইয়া থাকে।

অহল্যাবাইএর সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র-দেশে প্রচলিত একটী গাথা।

সকল দেশেই, তত্তদ্দেশীয় মহাপুরুষদিগের জীবনের কোন ঘটনা বা কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত কতকগুলি "গাথা" প্রচলিত থাকে। এই সকল গাথা প্রকারান্তরে ইতিহাসের বা জীবনচরিতের কার্য্য করে। মহারাষ্ট্র-দেশে এইরূপ যে সকল গাথা প্রচলিত আছে, [illegible]ব তুকারাম শালিগ্রাম ও বোম্বাই এনথ্রোপলজিকেল্ সোসাইটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আকৃওয়ার্থ (H. A. Acworth) নামক কোন গুণগ্রাহী ইংরাজ তাহা সংগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। পাণিপথের মহাযুদ্ধ হইতে মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত-বিশেষের মৃগয়া পর্য্যন্ত নানা ঘটনা-মূলক অনেকগুলি গাথা এই পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। * অহল্যাবাইয়ের সম্বন্ধে তাহাতে যে গাথাটী মুদ্রিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি। অহল্যার প্রকৃতি ও ধর্ম্মভাব কিরূপ ছিল, তিনি কিরূপ সুনিয়মে প্রজাপালন করিয়াছিলেন,

---

* এই সকল গাথার সম্বন্ধে আকৃওয়ার্থ সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটী পংক্তি এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,—

আশ্রিত জনের প্রতি তাঁহার কিরূপ বাৎসল্য ছিল এবং তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, এই গাথা হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। * ইহা সংক্ষেপে অহল্যার চরিত্রের সমালোচনা বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

(১)

কলিযুগে ধন্যা সতী অহল্যারাণী।
(ও) যাঁর কীর্ত্তিতে ভরেছে ভুবন, রমণীর শিরোমণি ॥
যাঁরে দেখ্‌লে নয়নে, পাপ না থাকে মনে,
রোগের জ্বালা পলায় দূরে, এমনি "পুণ্য-পরাণী" ॥
মিলে সাধু জন যত তাঁর গুণ গান ক.
তিনি, দৈববশে, হ'লেন এসে হোল্‌কারের কুলের রাণী ॥
কত কঠোর ব্রত, পণ, তিনি কর্‌লেন উদ্‌যাপন্,
হলেন্ ধর্ম্মবলে, পুণ্য-ফলে, আপন কুল-উদ্ধারিণী ॥
(ও) সেই মহেশ্বর-ধাম যেথা করতেন অধিষ্ঠান,
কাঙ্গাল, গরীব গেলে সেথায় লভিত বিশ্রাম :—
তিনি মাতা হয়ে দিতেন অন্ন, দীন, হীনের জননী ॥

"With the Marathas, as with every warlike race, the feelings of the commons have taken shape in ballads, which, however rude and inartificial in their language, their structure, and their rhythm, are the genuine embodiments of **National enthusiasm**, and are dear, and deserve to be dear, to those who repeat and listen to them.

(২)

কর্ত্তা "স্বত্ব" ধন দ্বিজে কর্‌তেন বিতরণ
নামে সদাই প্রীতি, পুরাণ পাঠে মন।
বিপ্রগণে যজ্ঞসভা হ'ত শোভাশালিনী॥

[illegible] শতে যাঁর কত দ্বিজ সদাচার
হোমকুণ্ডে ঘৃতধারা দিতেন অনিবার;
তিনি সহস্র আহুতি দিতেন, এমনি ব্রতধারিণী।

যিনি ব্রাহ্মণের করে, অতি ভকতি ভরে,
চাইলেন কোটী লিঙ্গ পূজ্‌তে শঙ্করে
দুঃখী জনে বিবা(হ) দানে
হলেন কীর্ত্তিশালিনী॥

[illegible] গাথার সহিত অপর দেশীয় গাথার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—The songs of the Rajput glorify the his individual ancestors in paltry internecine The scope of Moslem heroic poetry has a wider ut its characteristic is religious fanaticism, and inspiration is religion, not patriotism; but the ballads of the Marathas are the ballads of the men of Maharastra (the Great Nation), and as such burn through and through with patriotic fervour. Introduction to Historical Ballads of the Marathas

* আমাদিগের দেশেও পলাশীর যুদ্ধ, মহারাজা নন্দকুমারের [illegible], এবং তিতুমীরের লড়াই প্রভৃতি সম্বন্ধে এইরূপ গাথা প্রচলিত [illegible]। তাহা সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইবার যোগ্য।

যিনি পর্ব্বাহ-ক্ষণে ধেনু দিতেন ব্রাহ্মণে,
শিশুগণে দুগ্ধ-দানে বাঁচাতেন প্রাণে,
(ও) যাঁর করে সদা জপমালা থাক্‌তো দিবা, যামিনী ॥

(৩)

যত আছে তীর্থ ধাম, কিবা 'মহাক্ষেত্র' নাম,
"জ্যোতির্লিঙ্গ" আছেন যেথা নিত্য বিরাজমান,
ও তাঁর অন্নসত্র আছে সেথায়, অন্নপূর্ণারূপিনী ॥
যিনি অন্ধ, আতুরে, সদা করুণাভরে,
ঔষধি আর বস্ত্র দিতেন, আপনারে করে ;
দিয়ে ব্রাহ্মণেরে অগ্নিহোত্র (হলেন) ধর্ম্মরক্ষাকারিণী
বিনা ব্রাহ্মণ-পারণ (ও) যাঁর না হ'ত ,
(যিনি) দ্বিজ-পাদোদক নিত্য করিতেন সেবন,
ও যাঁর রাম-নাম-গানে সদা পোহাইত যামিনী ॥

(৪)

যিনি তীর্থগগণে সদা আনন্দ মনে
পাদুকা, প্রাবরণ, অশ্ব দিতেন যতনে,
দিয়ে গুণী জনে স্বর্ণভূষা (ছিলেন) গুণের আদরকারিণী ॥
প্রজায় করিতে রক্ষণ দেখ্‌লে দুষ্টমতি জন,
চরণে শৃঙ্খল দিয়ে করিতেন বন্ধন
(ও যাঁর) দেবতা-মন্দির শত ঘোষে কীর্ত্তিকাহিনী ॥

...র নাহি ছিল শেষ,

জলাশয় দানে সেথা ঘুচাইতেন ক্লেশ ;

তিনি স্নিগ্ধধারা ঢালি শিরে পূজিতেন শূলপাণি ॥

(৫)

যখনি পেলে গ্রহণ-মান, করতেন তুলা-ব্রত-দান,

স্বর্ণ, রজত, ঘৃত, মধু, তিল, তণ্ডুল, ধান্ ;

তিনি ছায়া-দানে পান্থ জনের ছিলেন আতপবারিণী ॥

স্কন্ধে লয়ে বারিভার,

যেতেন কত সাধু সদাচার,

ও যার সঙ্গে যেত তীর্থবাসে কত অনাথ, দুঃখিনী ॥

...য় সংসারবাসী তিনি ছিলেন উদাসী,

ও(তাই) ভক্তি-গুণে মুক্তি নিজে হলেন তাঁর দাসী ;

হায় ! ধরাতলে নাহি মিলে, এমন ধন্যা রমণী ॥

গঙ্গু হৈবতী বলে, করি মিনতি,

গণনা তাঁর গুণের করি কিবা শকতি ?

(মিলে) প্রভাকর, মহাদেব গুণী গায় তাঁর

গুণের কাহিনী ॥

সম্পূর্ণ ।